শিশু সাহিত্য পত্রিকা

কলি খাতা

বিষয়: সম্পর্ক

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলি

খাতা অগ্রহায়ণ ১৪২৪

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদকের কথা

গদ্য

দয়াময় মাহান্তী, বিপ্লব মাজী, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী
তৃপ্তি সান্ত্রা, পাপড়ি ভট্টাচার্য, তৃষ্ণা বসাক, স্বাতী গুপ্ত, অর্ণব মণ্ডল

কবিতা

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর সেনমজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অমিত চক্রবর্তী
ঊষসী ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সিনহা, পিয়ালী বসু, জয়ীতা ব্যানার্জী গোস্বামী
শাশ্বতী নাথ, সুমনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শোভন মণ্ডল, কাজরী বসু
আবদুস শুকুর খান, পারমিতা চক্রবর্তী, ভাস্কর সেন, মানালি চক্রবর্তী

গল্প

সাধন চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘোষ, সমীরণ কুণ্ডু
পার্থ মুখোপাধ্যায়, ঋক কুণ্ডু, সব্যসাচী বসু, অভিজিৎ চৌধুরী

ফিরে পড়া

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিজয়দান দেথা, বিষ্ণু নাগর

শিল্পকর্ম

অভিজিৎ শীল, অভিরূপ মৈত্র, সঙ্গীতা সেন
মারজান কবির, অভিষেক ইন্দু

গ্রন্থ আলোচনা ও সংবাদ

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলি খাতা

সম্পাদক

বিজয় দাস

যুগ্ম সহ-সম্পাদক

ঋষভ চৌধুরী, সুদীপ চক্রবর্তী

সহযোগিতায়

অভিজিৎ শীল, চয়ঞ্জীব শূর, সংলাপ দাস, অর্ণব মণ্ডল, শান্তনু গাইন, অমিত দাস

প্রচ্ছদ

সুদীপ চক্রবর্তী

অলংকরণ

গদ্য - শান্তনু গাইন

কবিতা - বিজয় দাস

যোগাযোগ

৩/৩৩/১, সারদা ব্যানার্জী রোড, চরকতলা, কলকাতা-৭০০১১১

চলভাষ ঃ ৯৮৩০৩১৯৩৮৯

Email : kolikhata@gmail.com / editor@kolikhata.in

Blog : www.kolikhata.wordpress.com

Website : www.kolikhata.in

অক্ষর বিন্যাস ঃ সিদ্ধার্থ দে (৯৮৩৬০৩৬১৩৩)

মুদ্রণ ঃ জয়গুরু উদ্যোগ, ৫৯, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদকের কথা

'সম্পর্ক' আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল একটি শব্দ। ভালোবাসা থেকে ঘৃণা, বন্ধু থেকে শত্রু এমনি বহু নামে, ভাষায় এবং অভিব্যক্তিতে সম্পর্কের সৃষ্টি। কিন্তু এই শব্দের ভিতরেই রয়েছে প্রকৃতির সকল রহস্য। সৃষ্টির রহস্য, ধ্বংসের রহস্য। কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কবদ্ধ। মহাবিশ্বে নক্ষত্রের বিস্ফোরণে সৃষ্ট ধুলিকণা, গ্যাস ও শক্তির সংমিশ্রণ এই সৌরজগত। বেদের কথায়, 'একম্ ব্রহ্মা দ্বৈত নাস্তি' অর্থাৎ ব্রহ্মা বা মহাবিশ্ব এক। সেই এক থেকে তৈরি দুই, দুই থেকে সহস্র। তাই সহস্র সূর্য, সহস্র পৃথিবী, সহস্র সৌরমণ্ডল একই সম্পর্কে অবস্থান করছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সৃষ্টি যেমন অবক্ষয়ের হাত ধরে ধ্বংস হয় তেমনি ধ্বংসের ভ্রূণেই জন্ম নেয় সৃষ্টি। তাই বলা যায় বিশ্ব হল সৃষ্টি আর ব্রহ্মা হল স্রষ্টা। উপনিষদের ভাষায়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মা তজ্জলানিতি' অর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্মা, ব্রহ্মেই জন্ম, পুষ্টি এবং প্রলয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন বহু সম্পর্কের বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত। কখনও ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, আবার ঘৃণা ও ভয়। কখনও অপরিচিত হয়েও শুধু মুখের মিষ্টি হাসি, আবার বহুদিনের ব্যবহারিক সামগ্রীর অভ্যাসগত সম্পর্ক। এমনই কিছু পরিচিত কিছু অপরিচিত সম্পর্কের বন্ধনে আমরা বাঁধা। শুধুমাত্র প্রাণী বা মানুষই নয় এই মহাবিশ্বে যা নিরাকার অথবা সাকার অবস্থায় বিরাজ করছে প্রত্যেকের মধ্যেই সম্পর্ক বিদ্যমান।

''কলিখাতা' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার ন্যায় এই সংখ্যাও বিষয় ভিত্তিক। এবারের বিষয় 'সম্পর্ক'। সম্পর্ক শুধুমাত্র মানুষ অথবা সামাজিক গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আদিকাল থেকে প্রতিটি অণুর সাথে অণু, ধ্বংসের সাথে সৃষ্টি, প্রকৃতির সাথে পুরুষ, মৃত্যুর সাথে জন্মের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে আসছে। সম্পর্ক কখনও সামাজিক, কখনও শারীরিক। আজকের দ্রুত ইন্টারনেটের যুগে মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, গাড়ি প্রত্যেকটির সাথে আমরা অভ্যাস গত সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার একটু পিছনে ফিরলে হয়তো অসম্পূর্ণ পড়া সেই গল্পের বই, কিংবা পুরানো হয়ে যাওয়া গীটার এমনি কত সাধারণ কিন্তু ভালোলাগার সম্পর্কে আমরা সকলেই ভেসে যাই। এই সংখ্যায় যেমন আছে সম্পর্কের আধ্যাত্মিক বা পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী তেমনি আছে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের সম্পর্ক। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক থেকে আজকের নিঃসঙ্গ সম্পর্কহীন জীবনের ছায়া আবার পুরানো সাদা-কালো সম্পর্কগুলো অনুস্মরণের চেষ্টা। কোথাও আছে সম্পর্কের বর্ণনাধর্মী গদ্য, কোথাও সাইবার ফেমিনিজম। পোষা কুকুর ও তার মালিকের সম্পর্ক, একটি মোবাইলের সাথে লেখকের সম্পর্ক। এইরকম বহু ভাবনার মিশেল ও শিল্পীদের দক্ষ আঁকিবুঁকির রূপ এই পত্রিকা।

পত্রিকার সকল পাঠক, যাদের ভালোবাসা ও উৎসাহ পত্রিকার এগিয়ে চলাকে বলিষ্ঠ করেছে। সকল লেখক ও শিল্পী, যাদের অসামান্য সৃষ্টিতে পত্রিকার পাতা অলংকৃত। সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী, যাদের ভালোবাসা, প্রচেষ্টা ও সৃজনী ভাবনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকা; প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরবর্তী সংখ্যা ঃ মৃত্যু

প্রাপ্তিস্থান
কলেজ স্ট্রীট ঃ পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু
রেলওয়ে বুক স্টল ঃ দমদম, বিরাটী, বেলঘরিয়া
ধানসিঁড়ি (রায়গঞ্জ)
এছাড়াও ৯৮৩০৩১৯৩৮৯, ৮৯৬১২১৮৮৯১

সম্পর্ক

দয়াময় মাহান্তী

উপনিষদ জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসেবে ব্রহ্মের একা থাকতে না-পারাকে উল্লেখ করেছেন। এই অসীম শূন্যে একা থাকতে ভয় পেয়ে তিনি মায়ার জগৎ রচনা করলেন। বস্তুত, এই মায়াটিও ব্রহ্মাই। কারণ এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি। এভাবেই ব্রহ্মা আসলে নিজেই নিজের সঙ্গে উপগত হলেন। যাকে আমরা বলতে পারি সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এটিই প্রথম সম্পর্ক সৃষ্টিতে। এবং নিরন্তর এত যে প্রাণের বৈচিত্র্য ও নানাবিধ সম্পর্ক বা সম্মেলন ঘটছে এ বিপুলা পৃথিবীতে তার সমস্তই ওই ব্রহ্মের স্বরূপ ও মায়া। অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মাকে এক ও অনেকের একমাত্র কারণ বলে মনে করে। পরমাত্মার থেকে সাময়িক দূরে চলে যাওয়াই জন্মের কারণ; মিলনে তার মোক্ষ। এই মিলন ও বিচ্ছেদের সম্পর্কই ফুটে উঠে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের লীলায়।

খৃষ্টান বা ইসলাম ধর্মে আদম ও ইভকে আদি মানব ও মানবী বলে মনে করা হয়। এবং তাঁদের মিলনে এ জগত রচিত। আদম ও ইভের ধারণাটির সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণাটি অনেকটাই মিলে যায়। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে সৃষ্টি রস, আনন্দ ও প্রাণের। এ যেন সেই সম্পর্কের স্বর্গীয় আপেল ভক্ষণের কারণ ও ফলাফল।

পুরাণ বা আধ্যাত্ম ছেড়ে যদি বিজ্ঞানের দিকে যাই, তাহলে কিন্তু এই অদ্বৈতবাদটির সমর্থন পাই। এ মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে জড়িত। এবং পোজেটিভ ও নেগেটিভ তড়িতের মিলন ও বিচ্ছেদে নানা রূপে, নানা গুণে প্রতিভাত। পদার্থবিদ্যা যেমন শক্তির নিত্যতায় বিশ্বাস করে, অধ্যাত্মবিদ্যাও মনে করে প্রাণের বিনাশ নেই রূপান্তর আছে কেবল।

প্রাণের এই অবিনাশী ধর্মটি কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খাটে। সম্পর্ক ছিল না, শুরু হোল—এই ভাবনাটি আপাত সত্য, এবং ভুল। তেমনি সম্পর্কের মৃত্যু হোল এই ধারণাটিও ভ্রষ্ট। আপাত দৃষ্টিতে দুটি প্রাণি, পশু, পাখি বা মানুষ যাদের জীবনে কখনও দেখা হয়নি, কথা হয়নি, আমরা মনে করি তারা পরস্পর সম্পর্কহীন। কিন্তু তা ঠিক নয়, তারাও বিভিন্নভাবে সম্পর্ক যুক্ত। জন্ম যেমন দুঃখের কারণ, তেমনি সম্পর্কেরও কারণ। সম্পর্কের একটি কেন্দ্রীয় বিন্দু আছে। এবং তার চারপাশে অসংখ্য ছোট-বড় বৃত্ত। একটি প্রাণীর সঙ্গে একটি প্রাণী, একটি জড় বস্তুর সঙ্গে আরেকটি জড়বস্তু, একটি প্রাণীর সঙ্গে একটি জড়বস্তু কোন না ভাবে এই ছোট-বড় বৃত্তগুলির নিরিখে সম্পর্ক যুক্ত। কেন্দ্রীয় বিন্দুটির যত কাছে বৃত্তগুলি আসতে থাকে সম্পর্কটির নাম-রূপ স্পষ্টতর হয়। দূরে থাকলে বা চলে গেলে এই পরিচয় অস্পষ্ট হয়। আর এই বৃত্তগুলি কেন্দ্রটির কাছে ও দূরে আসা-যাওয়া করতেই থাকে। ছোট ও বড় হয়ে। কিন্তু কখনোই একেবারে মুছে যায় না।

ফ্রয়েড সমস্ত সম্পর্কের মধ্যেই যৌনতাকেই কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। মা যে তার শিশুকে স্তন্য পান করান পরম আনন্দে। সাধারণ চোখে আমরা তো তার মধ্যে অপত্য স্নেহটিই দেখি। ফ্রয়েডের কাছে এই স্তন্যপান করার আনন্দটিও আসলে যৌনতৃপ্তি। একটি শিশুরও মায়ের শরীর ও মনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এই যৌনতার দ্বারাই। ব্যতিক্রম থাকলেও আমরা বেশিরভাগ সময় কি দেখি না বয়ঃসন্ধিকালে পুত্র মায়ের প্রতি, মেয়ে বাবার প্রতি অধিক আন্তরিকতা অনুভব করে! এটি কি ফ্রয়েড বর্ণিত যৌনাচরণকে মনে করিয়ে দেয় না? একটা কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, প্রাণীজ সম্বন্ধে যৌনতার ভূমিকাটি অসীম।

প্রেম। আমি নারী ও পুরুষের প্রেমকেই এখানে উল্লেখ করছি। এটি একটি আদি ও অকৃত্রিম সম্পর্ক। যুগে যুগে কত কত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও গান লেখা হয়েছে এ সম্পর্কটিকে নিয়ে। কত আদর্শের, কত মহানুভবতার কাহিনি আছে প্রেমের। প্রেমের প্লেটোনিক ধারণা নিয়েই কি কম লেখালেখি হয়েছে। প্লেটোনিক অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। এখানে দেহের

তেমন গুরুত্বই নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যে এই প্লেটোনিক প্রেম তেমন গুরুত্বই পেল না। সেখানে পরিষ্কার বলা হলো, শরীর ছাড়া প্রেম অচল। আধুনিক কবি দ্বিধাহীন বললেন, আমি তারে ভালোবাসি রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা সহ। সে যাই হোক সম্পর্কের বন্ধনে দেহ কিম্বা আত্মার বাঁধন নিয়ে শেষ সত্য উচ্চারণ করা তত সহজ নয়, বোধকরি অসম্ভব। কারণ এ এত জটিল একটি বিষয়, যার ভিতর প্রবেশ করলে সকলকেই অভিমন্যু হয়ে যেতে হয়।

অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে, জড় বস্তুর চেয়ে মানবীয় সম্পর্ক বেশি জটিল। জটিল বলেই উন্নত। পশু-পাখিদের সম্পর্ক সাধারণত জৈবিক প্রবৃত্তিটিই সম্পর্কের নির্ধারক। জড়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভৌত ধর্ম। মানুষের ক্ষেত্রে সম্পর্ক বহুমুখী, দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অনির্দিষ্ট। একজন মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের আলাদা আলাদা বৃত্তে আরেকজন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সব সম্পর্কের চালিকা শক্তি হিসেবে "স্বার্থ"-এর ধারণাটি এসে যাবেই। বাবা-মা সন্তান পালন করে, তার মধ্যেও স্বার্থ আছে যেমন, তেমনি একজন ছেলে একটি মেয়ের, একটি মেয়ে একটি মেয়ের প্রেমও পড়ে স্বার্থেরই কারণে। আমাদের চারপাশে যে আত্মীয় বা কুটুম তাদের সাথেও আমাদের স্বার্থেরই সম্পর্ক। দাতা ও গ্রহীতার, ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কটিও এ থেকে মুক্ত নয়। পদার্থের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই "স্বার্থ"টি বিদ্যমান—মানবিক ক্ষেত্রেও। স্বার্থ শূন্য কোন সম্পর্ক হতে পারে না—না মানবিক, না ভৌত, না জৈবিক। প্রসঙ্গত, ফ্রয়েড "স্বার্থ" বলতে যৌনতার স্বার্থটিকেই উল্লেখ করেছেন।

মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয়। মানব সম্পর্কের বিচিত্রগামীতা এ মহাকাব্যে যত বেশি প্রতিভাত তা বোধহয় অন্য কোন কাব্যে নয়। কুরু ও পাণ্ডব—আদতে একটি পরিবারের সম্পর্ক এখানে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের অগণন টানাপোড়েন হয়ে উঠেছে। কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। একজন ধুরন্ধর রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব। নানা সময়ে, নানা পরিস্থিতিতে মানব সম্পর্কের বদল ও তার কর্তব্যের ভাষ্যপাঠ করেছেন তিনি একজন বিশেষজ্ঞের মতোই। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এত হাজার বছর আগে রচিত এ কাব্যের ভিতরে কি প্রচণ্ড ফ্লেক্সিবিলিটি এক একটি চরিত্রে! একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে অন্য পুরুষের বিছানায় অবলীলায় যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন, শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের জন্য। এখানে স্বামীত্বটির সঙ্গে যৌনতা অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠছে না। যৌনতা শুধুই কখনও আনন্দ, কখনও সন্তান উৎপাদনের কারণ। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনতা নিছক একটি মুক্ত সম্পর্ক—এর সঙ্গে জোরপূর্বক বিবাহ, দাম্পত্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। যা আমাদের এত আধুনিক সমাজেও দুর্লভ। মহাভারতে, আরেকটি জিনিস খুব দেখি, একাধিক চরিত্রের একাধিক নাম। একাধিক ভীম, একাধিক পরীক্ষিৎ। এমনটা সাধারণত খুব বেশি ঘটে কি? আধুনিক নাটকে একটি চরিত্রের বহু শেড বোঝানোর জন্য কোথাও কোথাও এমনটি করা হয়। এই যে একজন মানুষ আলাদা নামে, এর মধ্যে একের মধ্যে বহুর সত্ত্বাটিকে বোঝানোর চেষ্টা—কি আধুনিক নাটকে, কি মহাভারতে।

একের মধ্যে বহুর অবস্থানের এই সত্যটি, আমাদের একটি সম্পর্কের ভিতরেও বহুমুখী করে তোলে। কোন সম্পর্ককেই তাই একটি নির্দিষ্ট নামে সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। একটি পিতা-কন্যার সম্পর্কে শুধুই অপত্য ধর্মটিই বজায় থাকবে এটি আরোপিত সত্য— প্রকৃত নয়। সেখানেও কিছু যৌনতা, কিছু বন্ধুতা, কিছু স্নেহ মিলেমিশে থাকবেই। এখানেও ভৌতের ধর্মটি প্রাসঙ্গিক। একটি অণুর ভিতরে পদার্থের সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকবেই। মূলে তো সেই পুরুষ ও প্রকৃতি। তার এত রূপ! এত সম্পর্ক! আর তাই প্রত্যেকটি সম্পর্কের ভিতরেই মূলের সবগুণই প্রকট ও প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবেই। এক কথায়, সম্পর্কের কোন নির্দিষ্ট নাম-রূপ হয় না। মহাভারত তা আমাদের দেখিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জুনকে কৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, যা শ্রীমদ্ভাগবত গীতা হিসেবে বিখ্যাত তাতেও পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পর্কের পরিবর্তনশীলতাটি দারুণভাবে বর্ণিত। এই মহাগ্রন্থে নায়কের চিন্তায় ব্যক্তির পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিন্ন দৃষ্টিকোণটিও দারুণভাবে ব্যঞ্জিত।

উপনিষদ দিয়ে নিবন্ধটি শুরু হয়েছিল, উপনিষদ দিয়েই শেষ হোক। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম থেকেই সকলের উৎপত্তি। প্রতিটি প্রাণী, পশু, পাখি ও মানুষ। তাই সকলের ভিতরেই এক ও আদিম ধর্ম জাগরিত। তা হল একের প্রতি আরেকের আকর্ষণ। মহাভারতের নায়কের নামও তাই কৃষ্ণ—যে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণ বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে আলাদা কৌণিক অবস্থানে ক্রিয়াশীল। আর তাই এত রঙ, এত রূপ, এত রসের বৈচিত্র্য! এই অবস্থানটি পরিবর্তনশীল বলেই বস্তু ও প্রাণীর সম্পর্কের এত রঙ বদল, এত রূপ বদল, এত রসবৈচিত্র্য। এত নাম। এত পরিচয়। এক থেকে বহু। বহু থেকে একের সম্পর্কে।

সম্পর্কের বীজগণিত

বিপ্লব মাজী

আভিধানিক অর্থে সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি রক্তের সম্পর্কে বাঁধা বা জন্মসূত্রে আত্মীয়তাকে। বিয়ে সূত্রেও যে আত্মীয় তাকেও সম্পর্ক বলি। এই সম্পর্কের মূলবীজ বা প্রাথমিক পরিকাঠামো পরিবার। মানব সভ্যতায় পরিবারের উৎপত্তি না হলে, কোন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ তৈরি হত না, সমাজ তৈরি হওয়া মানেই তা একটা সিস্টেমে বাঁধা, সিস্টেমের প্রথা, রীতিনীতি নিয়ম কেউ যদি না মানে সম্পর্ক তৈরি হয় না। আর সম্পর্ক তৈরি না হলে, পরিবারও তৈরি হত না। পরিবার তৈরি না হলে কোন সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রও তৈরি হত না। সম্পর্কের প্রাথমিক ইউনিট হল পরিবার। সামাজিক-নৃতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বের চোখে আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির দিকে তাকাই, তাদের প্রথা, রীতিনীতি ও পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করি, বিভিন্ন জাতি, উপজাতি বা জনজাতির সংস্কৃতির নির্মাণে সম্পর্কের ভূমিকা বিরাট। আত্মীয়তার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের একটা সিস্টেম। এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে সমগ্র সমাজের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা। আবার এমন সমাজও আছে, যেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যাদের রক্তের সম্পর্কে নিকট আত্মীয় বলা হয়। কিন্তু প্রতিটি সমাজেই আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত সেই সেই সমাজের সংস্কৃতি স্বীকৃত।

কিন্তু কোন একটি পরিবার, বা তাদের আত্মীয় স্বজন, রক্তের সম্পর্ক দিয়েই তো একটা সমগ্র সমাজের নানা পরিবার, নানা জাতের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না। পরিবারের বাইরেও, জীবনের নানা ক্ষেত্রে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরি হয়। যেমন পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়াও, পরিবারে পরিবারে পাড়াতুতো সম্পর্ক তৈরি হয়, নানা বৈচিত্র্যের কাজের ক্ষেত্রেও সম্পর্ক তৈরি হয়—যেমন অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সাইবার ক্যাম্পাসে। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক বা সরকারি বা রাজনৈতিক নানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। জনজাতির আইডেনটিটি নির্মাণ, বর্ণভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে। এরকম আরো অসংখ্য পরিসরেও মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরি হয়, যেখানে কাজ বা জাতিগত সত্তার সম্পর্ক থাকলেও, রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য সংস্কৃতির বিরাট ভূমিকা আছে।

প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে সম্ভব হলেও, আধুনিক সমাজে কোন মানুষ একমাত্রিক সম্পর্ক বা আইডেনটিটি নিয়ে বাঁচতে পারে না। আধুনিক মানুষ মাত্রেই বহুমাত্রিক। যে কোন নাগরিক ও সভ্য সমাজে বহুমাত্রিক পরিচয় বা সম্পর্ক নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। আধুনিক সমাজে একমাত্রিক সম্পর্ক বা আইডেনটিটি নিয়ে বেঁচে থাকে অন্ধ মৌলবাদীরা। বহুমাত্রিক সম্পর্কের বহুস্বর তাদের দু'চোখের বিষ। বহুমাত্রিক সম্পর্ক কখনই মানুষে মানুষে দাঙ্গা বা লড়াই বাধায় না, মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে না। বহুমাত্রিক সম্পর্কের জোরেই মানব সভ্যতা প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। যদিও যে কোন সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক জটিল, কিন্তু গতিশীল। গতিশীল না হলে, সম্পর্ক পাথরে রূপান্তরিত হত। সম্পর্কে রক্ত-মাংসের স্পন্দন থাকত না। সমাজ নৃ-বিজ্ঞানী ম্যলিনাউস্কি সম্পর্কের এই জটিলতাকে 'সম্পর্কের বীজগণিত' বলেছেন। অর্থাৎ, এক একটি সমাজের সম্পর্কের সূত্রগুলি জানতে হবে। সূত্র ছাড়া সেই সমাজের সামাজিক সম্পর্কের জ্যামিতিটি জানা যাবে না।

আধুনিক বা উত্তর আধুনিক সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্কের কোন ভূমিকা না থাকলেও, ছোট ছোট সমাজের ক্ষেত্রে, আজও সম্পর্কের ভূমিকা বিরাট। বিশেষত রক্তের বন্ধন (বিয়ে) বা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে। ছোট ছোট সমাজে ব্যক্তিকে নিজের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একজন সক্রিয় সদস্য হিশেবে বেঁচে থাকতে হয়। গোষ্ঠীর মিত্ররা তার মিত্র, গোষ্ঠীর শত্রুরা তার শত্রু। এইসব ছোট ছোট সমাজ তাদের নিজস্ব আইনকানুন, প্রথা, রীতিনীতি মেনে চলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় আইনের গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। রাষ্ট্র তাদের কাছে অ্যাবসার্ড ব্যাপার, সমাজ ও

সমাজের বিধিনিয়ম বড়। যা আমরা আজও দেখতে পাই হরিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশে 'খাপ্ পঞ্চায়েত' ব্যবস্থার মধ্যে, বা 'মুসলিম পার্সোনাল-ল'-র মধ্যে। এইসব ছোট ছোট সমাজে কে কার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে, কে কার আত্মীয় হতে পারবে, কে কাকে মানবে, কে কাকে মানবে না, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে? কে হবে না, সবই আত্মীয়তার সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা। যদিও এই সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়, পরিবারটি বা সমাজের মানুষটি যখন আধুনিক নগর সভ্যতার কেন্দ্রে বা কোন শিল্পনগরীতে এসে বসবাস শুরু করেন।

ছোট ছোট মাপের সমাজে সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সমস্ত মানব সমাজ, যারা প্রযুক্তির সহজ সরল জীবন যাপনে এখনো অভ্যস্ত, তাদের কাছে বায়োলজিকাল বা জৈবিক সম্পর্ক এখনই তৈরি করা সম্ভব—যখন সামাজিক সম্পর্কের নিরিখে কোন ব্যক্তি কোন নারী বা পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে মিলিত হতে পারে। সমাজে তার পরিচয়-ই রক্তের বন্ধন তৈরির অনুমতি দেয়। সর্বত্রই, ছেলে বা মেয়ে নারীর গর্ভে জন্ম নেয়। তারপর বাবা-মা সন্তান সন্ততির সম্পর্কের সূত্রে প্রতিপালন করে। একই বংশের পিতা পিতামহ থেকে শুরু করে যে শাখা-প্রশাখা বা বংশলতিকা বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কই প্রধান হয়ে ওঠে। বাবা, কাকা বা জেঠার ছেলেমেয়ে, সেইসব ছেলেমেয়ের ছেলে মেয়ে, এভাবে যে বংশলতিকা তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। লিঙ্গ ও বয়সের পার্থক্য ছাড়াও, যে রক্তের সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়ে তারও সামাজিক গুরুত্ব আছে।

মানুষের মতো পশুদের মধ্যেও, জৈবিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু মানুষে মানুষে সম্পর্কটা সচেতনভাবে মানব সমাজ নির্ণিত। আমাদের অনেক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে গড়ে ওঠে। অর্থনীতি মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে উঁচু-নিচু স্তর (যেমন বর্ণভেদ প্রথা) নির্মাণ করে, রাজনীতি ক্ষমতার জোরে সেটাকে স্থায়িত্ব দেয়, এবং সমাজের সবাইকে মেনে নিতে বাধ্য করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের সেই সম্পর্কের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের কথা বলে না। ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক কোন বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক না, যেমনটি অর্থনৈতিক বা আইনি সম্পর্ক। আমরা নানা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই বাস করি।

কোন সমাজে বায়োলজিকাল সম্পর্কের সীমানা নির্দিষ্ট। সামাজিক সম্পর্কের সীমা সীমাহীন। অবশ্য বায়োলজিকাল সম্পর্কের নিরিখে আমরা কোন জনজাতি বা উপজাতির সম্পর্কের নানা নৃতাত্ত্বিক উপাদান পাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যা কাজে লাগে। কোন জনজাতি বা উপজাতির সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বুঝতে সাহায্য করে। বংশগত ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে। অবশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক কখনই কোন ধ্রুবক না, তা পরিবর্তিত হতে পারে। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালী, মূল্যবোধ, ব্যবহারের ওপরও আত্মীয়তার বা সম্পর্কের পরিচয় নির্ভর করে। 'ভাই' শব্দটার বিবিধাংশ থাকতে পারে। যে কোন সমাজে সম্পর্কের ওপর সংস্কৃতির এক বিরাট ভূমিকা আছে।

আমাদের সামাজিক সর্বত্রই সম্পর্কের বিরাট ভূমিকার কথা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। সমাজে সম্পর্ক ব্যক্তির মর্যাদার স্থান যেমন নির্ধারণ করে, সামাজিক গ্রুপ-ও নির্ধারণ করে এবং উত্তরাধিকার। যে কোন সমাজে কোন ব্যক্তি যখন মারা যান, কিছু না কিছু উত্তরাধিকার রেখে যান—ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে, ভাবাদর্শগত, পারিবারিক বা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হতে পারে। জমি-জমা, টাকা-পয়সা, স্থাবর সম্পত্তি। তাঁর মৃত্যুর পর এসবের উত্তরাধিকারী কে হবে? তা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অন্যান্যদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ভর করে। সম্পর্কের নিরিখে সমাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আইনত তার সবকিছু উত্তরাধিকারী হিশেবে কে বা কারা কারা পাবে? ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, রাজনৈতিক সম্পর্কের জোরে এক নেতা বা নেত্রীর মৃত্যু হলে, তার কাছের জন তাঁর উত্তরাধিকারী হন এবং তা ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব হয়ে ওঠে। কিছু কিছু ছোট মাপের সমাজ ছাড়া, পৃথিবীর সর্বত্রই সম্পর্ক রেখাটি পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের রেখা ধরে চলে। মাতৃতান্ত্রিক সম্পর্কের আধিপত্য কিছু কিছু জনজাতি সমাজে টিকে আছে।

পোস্টমডার্ন সমাজে, যেখানে নগরসভ্যতা ক্রমশ গ্রামাঞ্চলকে গ্রাস করে আকাশে মাথা তুলছে, সেখানে হাইরাইজ সংস্কৃতি ও কর্পোরেট সংস্কৃতি সম্পর্কের নতুন জটিল বীজগণিত তৈরি করছে। বায়োলজিকাল সম্পর্কের সীমারেখা মুছে দিচ্ছে ডায়াস্পোরা সংস্কৃতি। সামাজিক বর্ণভেদ প্রথার স্তরবিন্যাস গ্রামাঞ্চলে আজও থাকলেও, কর্পোরেট সংস্কৃতিতে সম্পর্ক নির্ধারিত হচ্ছে অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে। নগর সভ্যতার হোমানলে বায়োলজিকাল বা রক্তের সম্পর্কের কোন মূল্য নেই। যে কোন সম্পর্ক নির্ধারণ করবে লিবারেল অর্থনীতি ও মুক্তবাজার।

যে গোলমেলে ঘটনা থেকে কারও কারও মুখে হাসি ফুশ্‌কে ওঠা, বা পেছনে লাগার প্রসঙ্গ, সেটা কিন্তু তুচ্ছ হলেও সাঙ্ঘাতিক। ছোটবেলার দিকে একটু হাসিমুখে ফিরে দ্যাখো, ঘটনাটার মধ্যে তোমরা সব্বাই কিছু না কিছু কমন পেয়ে যাবে। শিক্ষক-না-থাকা ক্লাসে ব্যাপক কলরব হয়ে চলেছে। একটি ছেলে তার সঙ্গীকে একটু চেঁচিয়ে ডেকেছে, অ্যায় অসীইইম .... ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন অসীমবাবু। ব্যস, বিগড়ে গেলেন তো গেলেনই! যতই বোঝানো হোক, ব্যাপারটা কাকতালীয়, সেই ক্লাসের অসীম বা যে তাকে ডেকেছে দুটোই ভাল ছাত্র—স্যারকে তারা খেয়ালই করেনি—অভিমানে উন্মাদ আর কিছুতেই সে সেকশানে ক্লাস নেবেন না। অনেক বোঝানোতে হয়ত কিছুদিন পর নরম হলেন একটু—কিন্তু অমনভাবে যে বোঝাবে, ততটা সময় কার আছে?

উন্মাদকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ শুনলে, দেখলে, আজও আমার বুকের ভেতরটা কেমন হিম হয়ে যায়। আমি, ছাত্রজীবন পেরিয়ে এসেও, যেটুকু সময় পেয়েছি, অসীমবাবুর স্বাভাবিক সঙ্গী—এই তো, কালই যেন আমার কাঁধ ধরে হাঁটলেন, এবড়োখেবড়ো বিধান সরণির ফুটপাথ ধরে দুজনে ঠিক পৌঁছে গেলাম গলির ভেতর ছোট্ট এক বাসায়, বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে, বইখাতা সামনে রেখে বসে আছে ঠিক আমারই মতন রোগা রোগা, ফর্সা একটা ছেলে, স্যারকে দেখেই যার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল! নিখুঁত উত্তর কলকাত্তায়ী ঘরানায়, উঠোন পিচ্ছিল হয়ে আছে ছড়ছড়ানো কলের জলে, খোলা উনোনের ধোঁয়ায় কিছুক্ষণ সব সাদা, সাদা .... ভেতর থেকে ছেলেটির মা বেরিয়ে এসে বললেন, এই তো, কাল সবে জ্বর ছাড়ল, আজ ভাত খাবে ....

হ্যাঁ, আমাদের ছোটবেলায় জ্বরজারিতে ভাত না খাইয়ে আরও দুর্বল করে দেবার একটা প্রথা ছিল। অসীমবাবু কিন্তু প্রিয় ছাত্রদের বেলা ঠিক মনে রাখতেন, কে কতদিন আসছে না। কেন আসছে না, তা নিয়ে জেনুইন ভাবনায় থাকতেন। আবারও মনে পড়ে গেল ক্লাসরুমের কয়েকটি মুহূর্তের কথা, কী সূত্রে এল প্রসঙ্গটা, তা মনে নেই। যে মানুষ তোমার মধ্যে, তোমার আড়ালে রয়ে গেছে, তাকে খুঁজে বার করে আনাই তো একজন শিক্ষকের কাজ ...

সেই মুহূর্তে, আমার কাঁধে অসীমবাবুর হাত, উজ্জ্বল আয়ত দুটি চোখে আশ্চর্য এক দীপ্তি। মনে করে, এই এখনও আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

দুর্গম, দুর্জ্ঞেয় যে মানুষ আপন অন্তরালে, তাকে, এই দেশকালে, আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে কে-ই বা বলে আর? এই মানুষে সেই মানুষ—কালকূটের নানান লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে এই কথা। এলোমেলো, দোহারা, দু-তিনদিনের দাড়িমুখ, গোল গোল উজ্জ্বল দু-টি চোখ, ধুতি ও খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা আমার স্যার অসীমবাবুর সঙ্গে এসব নিয়ে মাঝেমাঝে অনেক সহজ কথা হতো কিন্তু! আমার বাচনভঙ্গির উচ্চাবচ সমস্ত এলোমেলোমি ধরতে পারতেন চমৎকার—এমন কি, কবিতার ভেতরে ইল্‌লজিক্যাল ব্যাপারটাও যে একরকম লজিক—একথাও যেন তাঁকে বলতে শুনেছি। বিস্তৃত ছাত্রমহলে না, একান্তে আমার সঙ্গে। অসমবয়সি একটি সমৃদ্ধ আড্ডা মনে পড়ছে। তখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র নই আর। অবেলায় কলেজ কেটে, হেঁটে হেঁটে কফি হাউস অবধি এসে, পছন্দসই সঙ্গী না মেলায়, হেয়ার স্কুলের পাছদুয়ার পেরিয়ে ইডেন হস্টেলের পথে বেরোব ভাবছি— দেখি লম্বাচওড়া লাল দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় নর্দমার ধার-ঘেঁষা চাতালের ধাপে বসে। হাসিখুশি অসীমবাবু!

পাগল মানুষদের বিচিত্র বন্ধুবান্ধব থাকতেই পারে, কিন্তু কলুটোলা-জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট ফলপট্টির ব্যবসায়ীর মতন চেহারা তো ঠিক নয় এই মানুষটির। চোখের উজ্জ্বলতা অসীমবাবুর চোখের উজ্জ্বলতার স্পন্দনে বাজছে। উনি সহকর্মী, এখন নাকি জেলায় কোন স্কুলে পড়াচ্ছেন—আগে এই স্কুলেই ছিলেন। বুঝেছি, যাকে বলে মৌলবী স্যার। কলকাতার বাংলা স্কুলে লব্ধ জ্ঞানটির প্রয়োগে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। উর্দু এবং সংস্কৃত ভাষার শব্দার্থ, ধ্বনি তথা স্পন্দনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকথা হচ্ছিল। অসীমবাবু ইংরেজিতে রেগুলার হিসেবে, বাংলা ও সংস্কৃতে প্রাইভেট এম.এ—উর্দু শেখারও যে ইচ্ছে তাঁর ছিল, সে কথা বলেছেন অনেকবার। মূলত আমি বর্ধমানে বড় হয়েছি, ক্লাসমেট বা প্রতিবেশীসূত্রে অনেক ইসলামি নামের অর্থ যে জানি, কথায় কথায় সে কথা ওঠায় মৌলবীস্যার বেশ অবাক, খুশি-খুশি ভাব।

অসীমবাবু, ব্যাপারটা কাব্যসাহিত্য চর্চার দিকে ঘুরিয়ে দিতে চান—কিন্তু প্রসঙ্গ ঘুরে যেতে থাকে নানান দুষ্টু-দুষ্টু দিকে। দিল রওশান, এক বন্ধুর বোনের নাম—হৃদয়ের স্নিগ্ধ জ্যোতি বা দ্যুতি তো বোঝা যায় সহজেই। কিন্তু স্কুল ম্যাগাজিনে খুব কায়দা করে আধুনিক কবিতা লিখেছে যে, কবিতা না-বোঝা রসিকরা বরং তার নামের অর্থ জানতে বেশি আগ্রহী। উম্মেনাদরা ফরজানা। উন্মাদে উন্মাদে বেরাদরির ব্যাপার নয়, এর অর্থ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা—মেয়েটি সলজ্জ মুখে বলেছিল।

জানি না, আমিও এখানে সব ঠিকঠাক বলছি কী না, কেননা অসীমবাবু যে প্রবল লজ্জা পেয়ে বেজায় লাল হয়ে যাচ্ছিলেন, সেটাই বেশি করে মনে পড়ে। মৌলবী স্যার কিন্তু সমস্তটাই উপভোগ করছিলেন। তৎসম শব্দে ভরা আমার একটি ভাববাদী কবিতাও শুনলেন বেশ খুশি খুশি চোখে।

রমণীমোহমায়া জড়ানো ওই ভাববাদী কবিতা, 'বারোমাস' ও সাপ্তাহিক 'অমৃত' থেকে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসা কবিতাটি 'দেশ'-এ পাঠাব কি না ভাবছিলাম। অসীমবাবু খপ করে নিয়ে নিলেন স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে। ওতে তো একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত দিয়ে রেখেছি—সঙ্গে সুন্দর সুখপাঠ্য—উন্মাদনা-মোহমায়া কি প্রকাশ পাওয়া ভাল? দ্বিধা কাটতে না কাটতেই বেরিয়ে গেল ম্যাগাজিন, কবিতাটি একদম আনকাট, অতি যত্নে ছাপা। কিন্তু গদ্যে, তখন কেমন ক্ষেপে গিয়েছিলেন ভেবে এখনও কান গরম হয়ে যাচ্ছে, নিখুঁতভাবে এডিট করা হয়েছে বাক্যাংশ। পাহাড়ি পথের হেয়ার-পিন-বেন্ড, বাংলা করে লিখেছিলাম মেয়েদের চুলের কাঁটার মতন বাঁক—ওই মেয়েদের কাঁটা প্রসঙ্গটাই হাপিশ! তবু ভাল, ওই পথের বাঁকে লেখা কিছু সরস বাক্য, যথা Divorce Speed, if Married, বাদ যায়নি!

অভিমানী বালকের মতন ঘাড় বেঁকিয়ে রাখা অসীমবাবুর মুখ আজ মনে পড়লে, বড্ড মায়া লাগে। রমণীয় এই সংসার পথে, ঘাট-আঘাটায়, বনপথে বাঁশঝাড়ে কত না আছোলা বাঁশের ব্যবস্থাপনা—পঞ্চাশোর্ধ হরেক সাহেবসুবোদের কতভাবে তেতো হতে হতে, সরে যেতে দেখি। অসীমবাবুদের ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার-এর ধরণ আলাদা, কিন্তু অমনভাবে, মুখলাল হয়ে যেতে আর কাউকে কি দেখেছি? চিত্তরঞ্জন সাহা নামে ইংরিজির আরেকজন স্যার ছিলেন বটে। ব্যাচেলর। থাকতেন শ্রীরামপুর। ছেলেরা যখন মজা করে বলত, স্যার, আপনার গোঁফটা ইকুইলিব্রিয়ামে নেই—উনি বলে উঠতেন, একদম সময় পাই না রে! যাই হোক, সেই বিখ্যাত ব্যর্থ প্রেমের গল্প, স্যালভাটোর, পড়াতে পড়াতে উনি ক্যাবলা হয়ে যেতেন বেশ। ড্যামসেল্‌ল্‌ল্‌—বলে আনস্মার্ট হয়ে উঠতেন। গুডনেস! তবু আমার বলতে ইচ্ছে করে, মাই গুডনেস, লোকটা কবিতা টবিতা একদম বোঝে না গো! সবাই কি আর সংসারধর্ম না করলেই অসীমবাবু হন?

কলেজ জীবনে, নানান শিক্ষকদের ভেতরকার চোরাগোপ্তা দ্বন্দ্ব-ঈর্ষা-সংঘাত অনেকসময়েই সামনে এসে পড়ে। বোর হওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না ছাত্রছাত্রীদের—তবু এখনকার এক অতি-খ্যাত সাংবাদিক, রবি-জীবনী কেচ্ছাকাহিনি লিখে বিতর্কিত, সে সময়ে হাওয়া গরম করতেন ট্র্যাডিশনাল বাংলা সিনেমাকে তুলোধোনা করে, দুর্দান্ত মন্তব্য করেছিলেন সমসাময়িক ডিপার্টমেন্টাল হেড-কে নিয়ে। 'লোকটা এক লাইনও জীবনানন্দ পড়েনি, ভাবা যায়?'

কত কী না পড়েই তো কাটিয়ে দেয় জীবন কত মানুষ। পড়াশোনার সঙ্গে জীবনের ভিতর-বাহির আর কজনের মেলে?

সম্পর্কহীনতার যাত্রা

যশোধরা রায়চৌধুরী

সেই সে যুগে, প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময়ে, খুব দেখা যেত এক ধরনের উঠতি কবি। সে উঠতি কবির কবিত্ব গজাত যখন, তারা দাড়ি কামাত না, প্রচুর চা খেত, নিজে নিজের গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত, আর সারারাত হিন্দু হোস্টেলে সবার ঘুম নষ্ট করে জীবনানন্দ পড়ত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। যেমন প্রাতঃকৃত্যের বেগ চা খেলে আসে, বেশ খানিক জীবনানন্দ পড়ে নিলেই তেমনই কবিতা লেখার বেগ আসত।

হাসির কথা বাদে, আসলে তো তাইই। অন্যের কবিতা পড়তে পড়তেই নিজের লেখাশেখা। আমরা সবাই আমাদের ছোটবেলায় গাদা গাদা কবিদের বই কিনে সেগুলো পড়তুম। আওড়াতুম। ধ্যান জ্ঞান করতুম। যে যে নতুন কবি উঠছে তাদের লেখা পড়ে তুলকালাম আলোচনা হত কলেজ ক্যান্টিনে।

আমাদের আগের প্রজন্ম যা করতেন সব গ্রুপে, আড্ডায়, কমিউনে, একত্র দল বেঁধে। আমরা তাঁদের তুলনায় বিচ্ছিন্ন ছিলাম কিন্তু আমাদের ঘিরে থাকত অনেক লেখক কবির বই ও মুখ ... না দেখা কবিদের আত্মা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করত।

এই মুহূর্তে যে কবিরা গজাচ্ছে, তারা কি এমন ডেড বা লিভিং পোয়েটস সোসাইটিতে থাকে? না কি তারা বড় একা? তারা গ্রুপে কিছু করে না?

এতটাই একাকিত্ব যে বড় কবি, অগ্রজ কবি, না জানা কবি, সমসাময়িক কবিদের লাইন পড়ার, মুখস্ত করার বা জোরে জোরে আওড়ানোর কোন অভ্যাস নেই। অথচ এই যে আমি যা লিখছি তার বাইরে অন্যদের লেখালেখি দেখার ও পড়া, এর ফলেই পাওয়া যায় মানসিক সঙ্গ বা মনোবল, ধারাবাহিকতার মধ্যে "বিলং" করার আনন্দ। সমসাময়িকদের সঙ্গে যে স্বাস্থ্যকর রেষারেষি, এবং অন্যকে পড়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বুদ্ধ হওয়া, কখনো বা ভাবনা বা আদর্শটা আবছা নকল করার মতও যে ব্যাপার ... এগুলো কি ঘটছে এই মুহূর্তের কবিদের? নাকি এগুলো না ঘটে, বিষাদ, বিচ্ছিন্নতা ঘটছে।

আজকের একাধিক তরুণ কবির সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে তাদের কবিতা লেখার একাকিত্বটা খুব বেশি এই বিচ্ছিন্নতার কারণে। এটা ঠিক সৃষ্টিশীল "সকল লোকের মাঝে

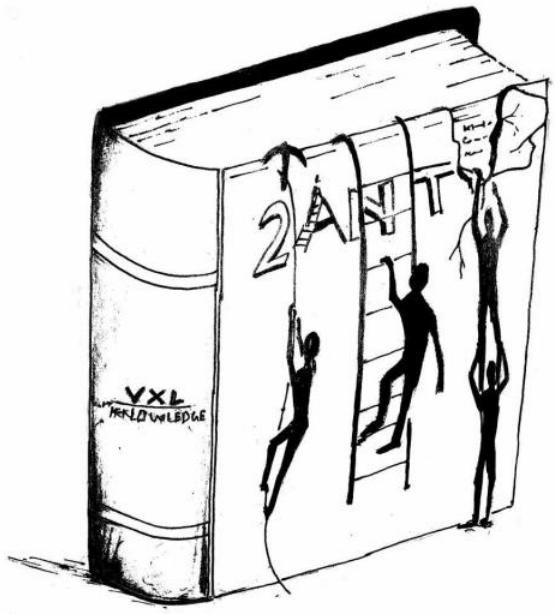

বসে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা" নয়। এটা অনেকটাই স্বার্থপর মানুষদের দুনিয়ায় আরো এক আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতাই। এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে কেউ দায়ী নয়। দায়ী সময়।

রাজস্থানের মরুভূমিতে যে কাঁটাঝোপ গুলোকে দেখা যায় সেগুলির মত জলহীন, বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে নাতো আজকের লেখকদের জীবন?

২

এভাবেই শুরু হয়েছিল আমার চিন্তাগুলো। সম্পর্কময়তা থেকে সম্পর্কহীনতার দিকে যাচ্ছি কিনা আমরা, একটা জাতি, একটা প্রজন্ম, একটা গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, এই ভাবনা ভেবে চলেছি রোজ। শুধু কবিতা নয়, নাটক, সিনেমা, গান বাজনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের দেখা আমাদের বিধ্বস্ত করছে। সিনেমা তৈরি হচ্ছে একই বিষয়ের ওপরে বার বার। সিনেমায় শুধু সিনেমা তৈরির জগতের গল্প বলা হচ্ছে। অথবা, পুরনো ছবির কাট পেস্ট বা কপি পেস্ট হয়ে চলেছে। এ সবই ২০০০ পরবর্তী দুনিয়ার প্রক্ষেপণ।

জীবনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ কেটে যাচ্ছে। ক্রমশ। কেন কেটে যাচ্ছে? কারণ মানুষের সঙ্গেও নাড়ির যোগ কেটে যাচ্ছে। এক মানুষ আর এক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হীন, এক প্রজন্ম আর এক প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন। দুটি শিশু পাশাপাশি বসে আছে শান্তভাবে। খেলছে না তারা। দুজনেই দুটো স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত। এমন "অমানবিক" দৃশ্য আমরা দেখি আজ গড়পড়তা সব

পরিবারেই। চার পাঁচটা বাচ্চা এক ঘরে বসে থাকলে যে যার নিজের ট্যাব বা ফোনে মুখ ডুবিয়ে দেয়। কেউ আর কারো সঙ্গে কথা বলে না, গল্প করে না। সবাই যে যার মত নিজে নিজে একাকী বলয়ে থাকে।

আসল মানুষ কম আগ্রহোদ্দীপক তাদের কাছে, বেশি আগ্রহের ওই চ্যাপ্টা ছোট স্ক্রিন। স্ক্রিনের সঙ্গে এই সেঁটে থাকা, এই অদ্ভুত স্ক্রিন-নির্ভরতা, মানুষকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করায় বাধা দিচ্ছে।

অথচ মানবিক কিছু গুণাগুণ তো তাদেরও আছে স্বাভাবিক ভাবেই। আছে প্রাকৃতিক চাহিদা। ভয় লজ্জা হিংসা কামনা বাসনা। সবটাই যদি কোন না কোন গেমের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়, সবটাই যদি নিজের নিজের বন্ধু মন্ডলির বাইরে, অপরিচিত ভার্চুয়াল অদ্ভুত কোন গুরু বা মেন্টরের সংগ থেকে আসে। যদি অপরিচিত কোন মুখ তাকে বলে দেয় কাল তুমি জেহাদি হয়ে কোমরে বোমা বেঁধে ভিড়ে যাবে, গানের কনসার্টে বিধর্মীদের মারতে। অথবা সহজেই বিস্ফোরক বানানো শিখিয়ে দেয় কোন ভার্চুয়াল গুরু। কোন ভার্চুয়াল মেন্টর বলে জীবন অর্থহীণ। ব্লেড নাও, হাতের শিরা কাটো।

সাম্প্রতিক খবর থেকে আরো বেশি জানতে পারছি আমরা এ কথাগুলি। ভারতের গ্রাম মফস্বলেও শিরায় শিরায় একাকিত্বের, সম্পর্কহীনতার বিষ কীভাবে চারিয়ে গেছে, ভেবে শিউরে উঠছি।

ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ নামের এক মারণ খেলায় মেতেছে ভারতের তরুণ কিশোরেরা। দেশের নানা দিক থেকে আসছে এই খবর। মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে এক কিশোর বারান্দা থেকে লাফিয়ে মারা গেছে। তাছাড়া, অনেক কে চিহ্নিত করা গেছে যারা খেলার নানা ধাপে আছে। ছোট ছোট মফস্বল শহরের কিশোর কিশোরী দের হাতে ফুটে উঠছে ব্লেডের আঁচড়ে তিমির আকার আকৃতি।

চ্যালেঞ্জের একটি ধাপ। এই ধাপের পর ধাপ, আসলে "তুমি কত সাহসী" তা বলে দেবে। সাহসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে প্রথমে জৈব প্রবণতার উল্টোদিকে গিয়ে নিজেকে আহত করার ম্যাসোকিস্টিক প্রচেষ্টা। একেবারে অন্তিম বা পরের ধাপ, আত্মহত্যা।

এই খেলার সৃষ্টিকর্তা রাশিয়ার এক বাইশ বছর বয়সী যুবক ফিলিপ বুদেইকি। ২০১৩ সালে শুরু এই খেলার। অনলাইন ছেলেমেয়েদের ভেতরে যারা দুর্বলচিত্ত, যাদের মনের ওপর সহজে প্রভাববিস্তার করা যায় তাদের এই খেলায় সে টেনে আনত। পঞ্চাশটি টাস্ক দিত। বিশ্রি, মনখারাপের ভয়ের ভিডিও দেখা থেকে ভোর পাঁচটায় উঠে চ্যাট করা ইত্যাদি আপাত কঠিন কর্মের চ্যালেঞ্জ দিয়ে শুরু খেলার। পঞ্চাশতম চ্যালেঞ্জ আত্মহত্যা।

বুদেইকি আপাতত জেলে। জেলে যাবার আগে সে নাকি সগর্বে বলেছে, এভাবে সে পৃথিবীর বুক থেকে দুর্বল রিক্তদের নিকেশ করছে, পৃথিবীর উপকার করছে। জঞ্জাল সাফাই। মনে রাখতে হবে, শুরুর দিকে সে চ্যাটে ও স্কাইপে ছেলেমেয়েদের নিজেদের কথা শুনতে চাইত। সেভাবেই সে জেনেছে কে কতটা দুর্বল, কতটা "ম্যানিপুলেট" করার মত, চরিত্রদার্ঢ্যহীন। বুদেইকি নাকি বলেছে, তার এইসব চ্যালেঞ্জে ওই নিপীড়িত বঞ্চিত রিক্ত বাচ্চাগুলো সুখ পেয়েছে। তার কথা থেকে তারা প্রথম কাউকে পেয়েছে যে "তাদের বোঝে, তাদের কথা শোনে", অর্থাৎ নিঃসঙ্গতার দাওয়াই হিসেবেই ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ উঠে এসেছে।

রাশিয়াতেই একশোর অধিক ছেলেমেয়ে এই মারণ খেলার বলি। মৃত্যুতে মদতদাতা হিসেবে বুদেইকিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ইন্টারনেটের তলপেটের অন্ধকার থেকে এখন ও ঘাই মারছে নীল তিমি। ছোবল দিচ্ছে মৃত্যু সাপ।

শুনতে পাবেন, কান পাতলেই, যে, ইন্টারনেটের ওপর দিকে যা কিছু অফিশিয়াল তা ঐ হিমশৈলের চূড়ার মত সামান্য পরিমাণ। বিশ শতাংশ। বাকি আশি শতাংশ ইন্টারনেটের অন্ধকার দিক। তলপেট। ইন্টারনেটের বেআইনি অংশ। যেখানে পাইরেসির স্বর্গ রাজ্য। যেখানে অতিকায় কেনাবেচা সবটাই আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে।

পূর্বতন কমিউনিস্ট দেশগুলির "লোন উলফ" জাতীয় একাকী বুদ্ধিমান ছেলেপিলেরা বেশি বেশি করে এইসব আশ্চর্য উদ্ভাবনের পেছনে থাকে। কম্পিউটারের জগতে সিদ্ধহস্ত রুশ বা ইউক্রেনিয়ান স্লোভেনিয়ান যুবকেরা বিশ্বের তাবড় তাবড় কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করে সিকিউরিটি বা সুরক্ষা বলয় ভেঙে ঢুকে সি আই এ বা পেন্টাগনের গোপন তথ্য চুরি করে নিচ্ছে, এ যেমন হামেশাই ঘটতে দেখা যায়, তেমনই, দেখা যাচ্ছে, নতুন নতুন মারণ "প্রোগ্রাম" ও আবিষ্কার করে ফেলছে তারা।

এই রকমের মারণ খেলার কথা আগেও শোনা গিয়েছে বিস্তর। খবরের কাগজের পাতায় বিদেশের পৃষ্ঠায়। আমরা জেনেছি নানা খেলার নাম। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রথম এভাবে মারণ রূপ ধরে এসেছে নীল তিমি। ইস্কুলে ইস্কুলে আলাদা করে কর্মশালা করে এইসব অপরাধমূলক সাইট, আত্মধ্বংসী খেলা ইত্যাদির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তবে সব প্রচেষ্টাই আমাদের একটু দেরিতে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। কিছু ঘটে যাবার পর আমরা জেগে উঠি।

এই একাকিত্ব, মানব মুখহীন ডিজি অ্যানিমেশনের দৃশ্যকাতরতা ক্রমশ গ্রাস করছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে। একটা বিশাল বড় প্রেক্ষিতে, সারা পৃথিবীর সব শিশু এখন একই রকম একাকী, ও ডিজিটাল নেশায় বুঁদ।

এর সঙ্গে সঙ্গে হাপিশ হত তারা, যারা বিজ্ঞানের জগতের স্বপ্ন দেখাত, সেই সব পাড়ার স্যার এবং পাশের বাড়ির পন্ডিত মানুষটি।

গুগুল মামা এসে গেছেন, কাজেই, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বকোষ ধরনের বই ... ডিকশনারি ... যেগুলো আমাদের হাতে জুগিয়ে দিতেন বাবা মা অথবা জ্ঞানী দাদারা, দু চারটে গাঁট্টা এবং "কিছুই তো জানিস না" মন্তব্য সহ, সেগুলোও গেছে।

আর গেছে সেই সব বন্ধুরা। যারা সাপ্লাই দিত গপ্পো বই। কোথায় গেল হাত থেকে হাতে ফিরতি হওয়া, লুকিয়ে স্মাগল করা, পড়ার বইয়ের নীচে লুকিয়ে পড়া কানদোমড়ানো বই ...

বৈঠকখানা থেকে চণ্ডীমন্ডপ, পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে কলেজ ক্যান্টিন, রান্নাঘরের উনুনের আশপাশ থেকে খাবার টেবিল, এমনকি দরজার সামনেটা, বারান্দার ধাপিটা, ছাতের সিঁড়িটাও ছিল মানুষের মুখে মুখে আশ্চর্য সব ছবি আর গল্পের গজিয়ে ওঠার জায়গা।

পিশি, মামু, কাকু, মা, বাবা, দিদা, ঠাকুদ্দা, সবাই খুব গল্প বলতেন। সেসব বলার সময়ে তাঁদের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হত, চক্ষু বিস্ফারিত হত, মুখ দিয়ে নানা আওয়াজ করতেন তাঁরা, হাত নেড়ে নানা আকার আকৃতি দেখাতেন ... একটা টোটাল এন্টারটেনমেন্ট প্যাকেজ। অ্যানিমেশনের চূড়ান্ত! এখন আমাদের বাচ্চাদের কাছে কার্টুন নেটওয়ার্ক আছে। একটা চ্যাপ্টা স্ক্রিন তাদের দাদু দিদা কাকা মামার জায়গা নিচ্ছে। তারা ট্যাব থেকে ফোন থেকে পড়ছে গল্প ... যা করছে সব একা একা একা।

৪

তাই পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা গান গল্প কবিতা আর হচ্ছে না। আমরা সকলেই ভাঙ্গচুরের লেখক কবি হব। আমরা পিকাসো হব। জানব না যে পিকাসোর ভাঙ্গচুর ছবি শুরু করার আগেও ছিল অন্য এক পর্ব। যে পর্বে তাঁর ব্লু পিরিয়ডের ছবিগুলি আঁকা। প্রথাগত, ইম্প্রেশনিস্ট আঁকায় হাতেখড়ি। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

আমরা হয় সবটাই নিজেরা আবিষ্কার করে ফেলতে চাইছি, ধারাবাহিকতা হীনভাবে। নয়ত সংযুক্ত বোধ করছি না প্রাচীন, সার্বজনীন আবেগের সঙ্গে। আমরা ভাবছি যা কিছু সার্বজনীন তা সবই মন্দ, বর্জনীয়। তাই প্রেমের গল্প বলছি না, অপ্রেমের কেচ্ছা ঘাঁটছি শুধু।

মানবিক হতে ভুলে যাচ্ছি।

আশা রাখি কোনদিন এই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে। নিজেদের ক্ষত, ক্ষয় ও ফাঁকা ঢপঢপ শব্দ ফেলে রেখে আমাদের ফিরে যেতে হবে, হবেই আবার মানবিক সম্পর্কের অবধারিত উপাদানে। কী শিল্পে, কী জীবনে, আবার আমরা যুক্ত হব।

সাদাকালো অ্যালবাম দিন

তৃপ্তি সান্ত্রা

১৬ আগস্ট, ২০১৭ ... বিবাহের জন্মদিনে আমার আর পিন্টুর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে রিনি। ক্যাপশন ঃ ৩৮ বছরের সাদাকালো album দিন ...

ওমা! কত লাইক আর কমেন্ট! কত হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, অক্ষর আশ্রমের গুরুভাই গুরুবোন, আমার তিরিশ চল্লিশ বছর আগের ছাত্রী ... ঝেপে নেমে এলো কত স্মৃতি!

কালো কুলো বেঁটে চেহারারও কত প্রশংসা! কেউ বল্লেন মিষ্টি, কেউ বল্লেন সন্ধ্যা রায়, কেউ শর্মিলা-সৌমিত্র, কেউ নুতন। পি.সি.— ফটো কার্টিসি কেউ জানতে চাননি। ছবির এতো প্রশংসা তো ছবিটা তোলার দক্ষতার জন্য। সেলফির যুগের ছেলেমেয়েরা পুরনো দিনের ছবি তোলার উত্তেজনা, স্টুডিও ফটোগ্রাফারের জাদুবাক্স আর অনন্ত পোজ দেওয়ার ধৈর্য্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাই করতে পারবেন না। ছবি দেখে আমার কৈশোরের বন্ধু ডাক্তার গৌতম কুন্ডু লিখেছেন— ছবিগুলো সাদাকালো কিন্তু আমাদের দিনগুলো ছিল রঙিন, এখন ছবি রঙিন কিন্তু ...!!! (সময় বলবে) ...

এমন নয় যে ৩৮ বছর পর আমরা প্রবীণ হয়েছি তাই রঙ খুঁজে পাইনা। শিবেশ দাস লিখেছেন 'সেই দুরন্ত সময় ... আর সেই স্বপ্নেরা ...'। সাতের দশক, আমাদের কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ। সারা বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা, শোষণ দমন পীড়ন যুদ্ধ আন্দোলন, ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে নিষেধের বেড়াজাল, প্রাচীর।

আমাদের স্বপ্ন, আমাদের সমাজ পাল্টানোর অসুখ, আমাদের বেঁধে বেঁধে থাকার অক্ষর প্রয়াস নিয়ে এখনও সাদা কালো পৃথিবী ... বিশ্বায়নের পদাঘাতে মুছে যায়নি সেই পৃথিবীর আলোছায়া জগৎ। মাদার গাছের তলায় আঁধার হবার মায়া দিন, জাদু-লণ্ঠন আঁকড়ে সেই দিনের স্রোতে ভাসা।

খুব উপকরণ ছিল না আমাদের কারো। শপিং ধামাকা নেই, সেলিব্রেশন নেই, আশিরনখর একান্ত গভীর গোপন দাম্পত্য বিছানা অব্দি ফটো সেশনের উন্মাদ বিকৃতি নেই। স্লেটে লিখি মুছে ফেলি আবার লিখি। সঞ্চয় মাথায়, হৃদয়ে। ছোপছোপ কাটাকুটি সেলুলয়েড আমাদের হৃদয়ে।

একটা দুটো ফটোগ্রাফি বিলাস থাকে তবু। প্রয়োজন থাকে। জন্ম মৃত্যু বিবাহ ... ধরে রাখে মেঘুদা বা অনুপদার ক্যামেরা। আমাদের বর-বউ ছবির ফটো সৌজন্য ঃ অজন্তা স্টুডিও, মকদমপুর, মালদহ। ফটোগ্রাফার ঃ অনুপ সিংহ।

সাতের দশকে আমার ছোড়দা আলফা ক্যামেরা কিনেছিলেন। মাথা কালো কাপড়ে না ঢেকে সে ক্যামেরায় দিব্যি ফটো তোলা যায়। ছোড়দার শৌখিনতায় অনেক দুর্লভ ছবি আছে আমাদের। বাবা-মাকে নিয়ে আমাদের আট ভাইবোনের বউ বর ছেলে মেয়ে নিয়ে বিরাট ক্যানভাস। ১৯৭১ সালের বন্যার দুর্লভ সব ছবি।

কিন্তু ছোড়দার ক্যামেরা কেনার আগের ছবিগুলো কারা তুলেছিলেন? আমাদের দোতলার ছাদে মেজদার বিয়ের পর তোলা গ্রুপ ফটো? আরো আগে বড়দির বিয়ের ছবি, আমার চেয়ারে বসে বইপড়া ছবি, মায়ের কোলে ছবি, দাদার মেয়ে মঙ্গলাকে জাপ্টে কোলে নিয়ে পিসি ভাইঝি ছবি? ফুলশয্যায় মেজদা মেজবৌদির একান্ত ছবিটি মেজদার কলকাতার বন্ধু দীপঙ্কর ঘোষাল তুলেছিলেন, মনে আছে। কিন্তু তারও অনেক আগে, আমার ছোড়দির ফ্রক পরা ছবি আর বোট নেক ব্লাউজ পরা, থুতনিতে বিউটি স্পট আঁকা, মেজদি ফাল্গুনীর সাদা কালো ছবি? তুলসীতলায় বাবার মৃতদেহ ঘিরে শোকদগ্ধ মায়ের পাশে আমাদের অসহায় মুখ ... কে তুলেছিলেন?

ক্যামেরাম্যান মেঘুদা। ক্যামেরাম্যান সুধীর দাস। কালো ক্যামেরায় মাথা ঢাকা ক্যামেরাম্যান, আর চেয়ারে বেঞ্চে বা মাটিতে বসা ভালো ছবি তোলার জন্য মরীয়া পাথর থেকে পাথর হয়ে যাওয়া আমরা। 'উহুঁ-উহুঁ হচ্ছে না, হচ্ছে না, মাথা সোজা কর। আপনি নড়ে গেছেন। মামীমা হাত দুটো সামনে ছড়িয়ে বসুন ...'

এতদিন পরও ছবি তোলা নিয়ে নটখট চঞ্চল চপল আমাদের, আমাদের দাদা-দিদি-বৌদিদের হইচই শুনতে পাচ্ছি। ছোড়দি তো ক্যারিকেচার করতে ওস্তাদ, সব ঠিকঠাক করে যেমনি ক্যামেরাম্যান পেছন ফিরছেন, সে একটি ভঙ্গি দিল। আবার হি হি। বড়দের ধমক। ক্যামেরাম্যানের জরুরি ঘোষণা ঃ আমার পিরোজপুরে ডাক আছে। এতো সময় নিলে কিন্তু পারব না ... সুতরাং এবার সিরিয়াস। স্পীকটি নট। ঘুলঘুলির পায়রার একটু বক্‌বকম্—ওকে ক্যামেরা করা যাবে না? বাজে বকিস না খুকু। একদম মুখ বন্ধ করে ক্যামেরার দিকে তাকা। মুখ বন্ধ করে

কতক্ষণ, ক্যামেরা কাকু সেই পেছনে গেলেন তো গেলেন-ই। এক সেকেন্ডও ঠিক থাকে না যারা, তার অতক্ষণ ধরে চুপ করে থাকতে পারে নাকী। সোজা তাকাতে তাকাতে মাথা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আর সেই বাঁকানো মাথাটি ভঙ্গি হয়ে গেল, আজ অব্দি। চিরদিনের।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি বা সাতের দশক থেকে স্টুডিওর রমরমা। বিভিন্ন কাজে পাসপোর্ট সাইজ ছবি লাগে। কনে পছন্দের জন্য ফটো তুলতে হয়। 'রূপ থাকলে ধরে দেব, না থাকলে গড়ে দেব' এমন চমৎকার সব কথা আর রূপ ধরা বা গড়ার সেই ভঙ্গিটিও বড় আটপৌরে সুন্দর। বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুললে কুঁচিটা একটু ছড়িয়ে যায়, আঁচলটা বাঁ হাতের ওপর দিয়ে টেনে, ছড়ানো। চোখ ক্যামেরার দিকে। আমার নিজের পছন্দে বিয়ে, সুতরাং কনে পছন্দের ফটো তোলার প্রশ্ন নেই। তবে ছোড়দি থেকে তপু—নানা জনের ফটো তোলার সাথী ছিলাম। ক্যামেরার সামনে পোজ দেওয়া ভঙ্গি, আর তারপর হাতে গরম ফটো পেয়ে খুশী, ভালোলাগা, বিরক্তি এবং আনন্দ—বাঃ! কী চমৎকার লাগছে ছবিতে। একটু হাসি আনতে বলছিলেন ক্যামেরা, সেটা চমৎকার ধরেছেন কিন্তু! ছোড়দিতো মহাখুশী—মোটেও মোটা লাগছেনা বল।

কনে দেখা ফটোগুলো পরে লক্ষ্য করে দেখেছি একইরকম ভঙ্গিতে তোলা। পেছনে তাজমহল, ফোয়ারা সে সব কিছু নেই। টেবিল, ফুলদানি আর স্বপ্নে দেখা রাজকন্যেটির স্মিত মুখ।

অজন্তা স্টুডিও বা দাস স্টুডিও-র এই পরিচিত ভঙ্গির পরিবর্তন এলো সাতের দশকের মাঝামাঝি। রাজমহল রোডে, তমালদার সাথী স্টুডিওতে। যেখানে তপুর নতুন আবিষ্কার তমালদা বা তমালদার নতুন আবিষ্কার তপু। কনের ছবি তোলার চিরায়ত ভঙ্গিটি পাল্টে গেল, সমর্পিত নিবেদন নয় একটু যেন লাস্যময়ী নায়িকা ভঙ্গি। কানে বড় গোগো রিং পরা, একটু ঘাড় কাত করে ক্লোজ-আপ—অসামান্য উঠেছিল তপুর ছবি। পাঁচ-চার হাইট, কোমর অব্দি চুল, পানপাতা মুখ, অসম্ভব বুদ্ধিদৃপ্ত মায়াবী চোখ—একটু বেশি রোগার জন্য প্রাণচঞ্চল মেধাবী তপুর 'আমি তো রোগা—আমি তো রোগা' বলে একটা ঘ্যানঘ্যানানি ছিল। তো এই ছবির এফেক্ট এবং আমাদের হৈ হৈ উল্লাস, উৎসাহ আর কারো কারো ঈর্ষাজড়ানো মুগ্ধতা তপুকে আত্মবিশ্বাসী করে তুললো রাতারাতি। ছবি তোলার নেশায় পেল তাকে। মুঘল-ই-আজম কায়দায়, শাড়িটা ঘাগরার মতো কার্পেটে ছড়িয়ে বসেছে তপু, দীর্ঘ বেণী, নাকছাবি, হাসছে—পুরনো ঘরানার এফেক্টে অসামান্য একটা ছবি। সাদা কালো। কপালে একটা লালটিপ এঁকে দেওয়া।

অজন্তা, চন্দনা, দাস স্টুডিওর পুরনো ঘরানার বাইরে, সাথী স্টুডিও-র এই এক্সপেরিমেন্ট চমৎকার।

বাজারে তখন নতুন ক্যামেরা ন্যাশনাল 35 চলে এসেছে। সচ্ছল মধ্যবিত্তর আয়ত্তে সে জাদুবাক্স। তপুর ইঞ্জিনীয়ার বরের ইয়াশিকা ক্যামেরায় ফটো তোলার শখ আর দার্জিলিং-এ বাড়ি এবং চাকরি—সতুরাং নিরন্তর ফটোসেশনে তপুর নিজেকে অনন্ত আবিষ্কার।

সিঙ্গল বাস্ট ছবিতে সাথী স্টুডিও বিপ্লব ঘটালেও, বিবাহ পরবর্তী যুগলবন্দী ছবি তোলায় অজন্তার ধারে কাছে কেউ ছিল না।

নতুন ক্যামেরা এসেছে কিন্তু তার কারিকুরি বাঙালি বাবুর তখনও তত আয়ত্তে নেই। বিয়ের ছবির দাওয়াত নিয়ে নতুন ক্যামেরা কেলোর কীর্তি করে ফেলছে। কুলো, আগুন আর খই-কে ঠিকঠাক আনতে গিয়ে বরকনের মাথা কাটা। ফুলশয্যার ঘনিষ্ঠ ছবির স্বাভাবিক এফেক্ট আনতে গিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার। না, বাবা, বিয়ের পরে একটা হাসি হাসি মেড-ফর-ইচ আদার ছবির জন্য, নতুন ক্যামেরা আর ক্যামেরা ম্যানের ঝক্কি নেবার কোনও মানে হয় না। ভরসা থাকুক পুরনো অজন্তায়। আমি-পিন্টু, কৃষ্ণা-প্রবীর, মন্টু-মনসিজ, বনানী-ত্রিদিব, শ্যামলী-স্বপনদা, জয়া-বিশ্বনাথ—আমার সংগ্রহে থাকা ছবিগুলো দেখছিলাম। সাদা-কালো ছবি। সামান্য একটু ঘোমটা টানা। ক্যামেরার সামনে একটু অস্বস্তি—যাকে লজ্জা বা ব্রীড়া বলে মনে হয়। যার যেটুকু খুঁত, কমতি বা বাড়তি সব মিটিয়ে দিয়ে চমৎকার এডিট। সাদা কালো ছবি আবৃত্তিযোগ্য কবিতার মতো উচ্চকিত নয়। নিমগ্ন হয়ে রূপসী বাংলা পাঠের আত্মমগ্নতা।

বিয়ের পর বর-বউ ছবি, বাচ্চা হবার পর ল্যাকপেকে ঘাড় নিয়ে তিন-চার-পাঁচ মাসের বাচ্চাকে চেয়ারে বসিয়ে ছবি তোলার পর্ব। তমালদার তুলে দেওয়া বাবাইয়ের ছবি দেখতে দেখতে অপূর্ব বলল, আমারও অমন একটা ছবি আছে। আর পাশে বাবা ধরে আছেন, যাতে আমি পড়ে না যাই। বাবাইয়ের ছবির পাশেও কেউ আছেন, অদৃশ্য। বাচ্চার আলাদা ছবি। ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে সুখী পরিবারের ছবি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের স্মৃতিকে ধরে রাখার নানা প্রয়াস।

স্টুডিওতে আমাদের বেড়ে উঠার বিভিন্ন পর্বের ছবি দেখছিলাম। আমার আর মঙ্গলা, আমার দাদার মেয়ের ছবি। কৃষ্ণা, আমার বড়দির মেয়ের সঙ্গে ছবি। তখন আমাদের বিনোদন লছমী, রূপকথা, বিচিত্রায় সিনেমা। নিষাদে মোগলাই। আর অল্প বয়সের বন্ধুত্বের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য স্টুডিওতে কখনও ফটো তোলা।

ছোটো থেকে কত যে নাটক নাচগান করলাম—তার একটাও ফটো নেই বঙ্গরঙ্গ মঞ্চ শতবর্ষে 'অলীকবাবু' আর 'কৃপণের ধন' নাটকের কুশীলবদের নিয়ে গ্রুপ ফটো ছিল, হারিয়ে

ফেলেছি। পাড়ায় সরস্বতী পুজো হবে না, তো আপুদি ঝুনুদির সাথে সবাই মিলে হৈচৈ করে পুজো হল। পুজোর টিমের আমরা স্টুডিওতে গ্রুপ ফটো তুলেছিলাম। —কী চমৎকার কৈশোরের যৌবনের সেই ছবি! বারো-চোদ্দ জন, মোটা রোগা, লম্বা বেঁটে, শাড়ি ফ্রক, চুড়িদার। প্যান্ট-গেঞ্জির একজনই—শহরের জিনত আমন, আমাদের পাড়ার মলি। চেয়ারে বসিয়ে, দাঁড়িয়ে আমাদের দুরন্ত কোলাজ তৈরি করেছিল অজন্তা স্টুডিওর ক্যামেরা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাণীভবানী হস্টেল থেকে এক সকালে আমি, কলি, রীতা, রাণী যে নাচতে নাচতে নাইতে গেলাম বালাসন নদীতে—তার ছবি নেই। তবে আমাদের দোল খেলার ছবি আছে, শিবমন্দিরে তোলা। উৎসা, কলি, কাবেরীর সঙ্গে আমি, মীনাক্ষিদি আর রীতা। এ ওর কপালে আবির দিচ্ছি এমন একটা ছবি। ছবি তোলার জন্য ছবি তোলা, স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। কিন্তু একসঙ্গে ছিলাম, এত দিন বাদে সেই স্মৃতিটুকু খুব জিদ্দি। চাইলেই তুলে ফেলা যায় না।

এইভাবেই পিকনিকের বাজার করতে গিয়ে শিলিগুড়ির টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আমাদের ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের ছবি। দুই যুবতীর মাঝে, চাপে হাঁসফাঁস করছে প্রদোষ। গুরুগম্ভীর টেকো মাথার সরীফউদ্দিন আহমেদ, সীনিয়র বিমানদা। ইংরাজির সোশাল পেপার গ্রুপে মাত্র চারজন নভেল নিয়ে ছিলাম—আমি, রীতা মন্ডল, কৃষ্ণা ঝা আর প্রভাত গুরুং। এই গ্রুপের ছবিও আছে। কিন্তু দুই গ্রুপ ফটোর বন্ধুরা সবাই নেই।

সরীফ উদ্দিন আহমেদ, দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছিলেন। ঢোলা পাজামা, পাঞ্জাবি, টাক মাথার সরীফদা চিরদিনই মাঝবয়সী প্রচ্ছদ নিয়ে গুরুগম্ভীর দাদা হয়ে রয়ে গেলেন আমাদের কাছে। খুব সীরিয়াস। ঝড়ের গতিতে লেখেন। আমাদের কলেজ মেট এবং ভার্সিটি মেট তিনি। এম.এ-তে টপার হতে পারেন নি, কাছাড়ের কলেজে পড়াতে যান। সে চাকরি ছেড়ে মালদার গৌড়বঙ্গ কলেজে যোগ দেন। দীর্ঘদিনের চাকরি তবু সম্ভবতঃ আসামের চাকরি ছেড়ে আমায় ব্রেকেজ অব সার্ভিস হয়ে যায় এবং সীনিয়র হওয়া সত্ত্বেও প্রিন্সিপাল হতে পারেননি সরীফদা। ড্রিপেশনে, মানসিক আঘাতে চুরমার হয়ে যান, মারাও গেলেন তাড়াতাড়ি।

সাতের দশকের শেষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমান্টিক জুটি বালুরঘাটের রীতা মন্ডল, কাসিয়াং-এর প্রভাত গুরুং। রীতা চত্বর কাঁপানো সুন্দরী। প্রভাত কবি, গায়ক এবং রোমান্টিক প্রেমিক। পরে ওরা বিয়ে করে। কাসিয়াং-এ চাকরি পায় দুজনে। ষাট বছর বয়স হবার অনেক আগেই প্রভাত চলে গেছে। আমাদের চারজনের সাদা-কালো ছবিতে, তিন যুবতীর মাঝে অনিন্দ্য সুন্দর যুবকটির চোখে মুখে শরীরে কোথাও মৃত্যু ছায়া নেই। ঝিপঝিপে বৃষ্টিতে গিটার বাজিয়ে সে গাইছে 'চ্যাংমা হো চ্যাংমা' ঝলমলে হাসিতে গড়িয়ে পড়ছি আমরা।

আরো আগে সত্তরের শুরুতে, যখন আমরা নবম শ্রেণী ও শাড়ি-বাড়ির অসংখ্য অসংখ্য বাধা নিষেধের মধ্যে একটি হল, ব্যাটাছেলের থেকে দূরে থাকা। তাদের সঙ্গে ছবি না তোলা। শুধু শুধু তাদের সঙ্গে ছবি তুলতেই বা যাব কেন? হ্যাঁ, তুলবে না। ওই এক ছবি দিয়েই জীবন তছনছ করে দিতে পারে। কীভাবে? অন্য জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হলে ভেঙে দিতে পারে। ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। আর আমি নিজেই যদি ছবি তুলি। বিয়ে করতে চাই। কক্ষনো না। প্রেম আর বিয়ে এক নয়। প্রেম করলে লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না।

তো প্রেম করলেই, ছবি তোলা যাবে, এমন নয়। ছবি তুলতে পয়সা লাগে। নারায়ণদা, কেয়াকে নিয়ে অজন্তা স্টুডিওতে ছবি তুললেন—চাকরি করতেন বুঝি তখন। তো সেই ছবির জন্য কম কেলেঙ্কারি হল না।

ছবির কপিগুলো নিজের কাছে রেখে বারবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তরুণ দৃপ্ত যুবকটিকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল কেয়া। বামুন বাড়ির মেয়ে, দাস ছেলের সঙ্গে ছবি তুলেছিল। পাশাপাশি বসা, চোখে মুখে পিরীতি আঠা, সে গেল, হাতের সঙ্গে হাত যে পাশাপাশি ছুঁয়ে গেছে। তো ভাঙ। ভাঙ। ভাঙ করার মতো কাট। কাট কাট। যুগল ছবিকে খন্ড খন্ড করে সিঙ্গল করা হল। নেগেটিভ কই? নেগেটিভ কই? অজন্তা তো নেগেটিভ দেয় না। দেয়না বললেই হবে, দিতে হবে!! দলবল নিয়ে প্রচুর বাওয়াল করে অজন্তার অনুপদার কাছ থেকে নেগেটিভ উদ্ধার করে আনলো কেয়ার ছোটো মামা। নারায়ণদার কাছে রাখা ছবিটার সন্ধান ছোটো মামা পাননি। খুবই চাপ, শাসন আর বাড়াবাড়িতে ছবির নায়ক নায়িকা, সময়ের আগেই বিয়ে করল। বাড়ি থেকে পালিয়ে।

কথা প্রিয়। তার চেয়েও প্রিয় লেখা চিঠি। সে তো ফুরোয় না, থেকে যায়, সব মিথ্যে শিহরণ নিয়ে। কায়া প্রিয়। তার চেয়েও প্রিয় ছায়া, ছায়া-ছবির মানুষ। হারিয়ে যাওয়া কৈশোর আর যৌবনের দু-একটা ছবি ঘিরে আমাদের মুগ্ধ শিহরণ। মেক-আপ করাচ্ছেন না। পেইন্টারের মতো! তুলি দিয়ে চোখ আঁকছেন না ভুরু আঁকছেন না ঠোঁট আঁকছেন না। ক্যামেরার পেছনে তাঁর তৃতীয় নয়ন তৈরি করছে প্রতিবিম্বর নতুন বয়ান। তখন ক্যামেরার দুরে। স্রষ্টার তৃতীয় নয়ন দুরে। সট্ সট্ করে ক্যামেরার মায়া-মুকুরে সেলফি তোলার ভাবনা, কল্পনাতেও ছিল না। পোট্রেট আঁকার জন্য সময় দিতে হয় দীর্ঘ। রবি বর্মা আঁকছেন দময়ন্তী আর হাঁস। লেডী রাণুর পোট্রেটের জন্য যেন কটা সিটিং?

এইসব তুলি ইজেল মডেলের অলৌকিক জগৎ থেকে একটু মেড-ইজি স্টুডিওতে ক্যামেরার ফটোসেশন। বাড়িতে একটা ড্রেসিং টেবিল, ড্রয়ার দেওয়া, চমৎকার পেখমের মাঝে আয়না। সেখানে মুখ দেখে অন্ততঃ কুড়ি জন। নিজেকে আবিষ্কারের অত সুযোগ কোথায়। হ্যাঁ, আসল আয়না হচ্ছে ঘনিষ্ট বান্ধবীদের চোখ। তাদের চোখেই নিজেদের আবিষ্কার—কার মুখ পানপাতার মতো। কার দীঘি আঁখি। কে অপর্ণা ছাঁচ আর কে জীনত আমন।

আর দর্পণে শরৎশশী, বিম্বাবতী রূপদেখা যেন ঐ পোস্টকার্ড সাইজ ফটোগ্রাফে। মাথা একটু সোজা। মুখে একটু হাসি রাখো। না, হল না। আবার ক্যামেরা থেকে এগিয়ে এসে মাথা ঠিক করে দিলেন তিনি। অত জড়সড় কাঠ কাঠ ভাব কেন! ক্যামেরার সামনে নয়, ভাবো এমনি বসে আছ! প্রাণপণে নির্দেশ মেনে চলছি কুশীলব। কারণ তৈরি হচ্ছি আমরা। সেই ফুরিয়ে যাওয়া বিকেল, সিরসিরে বয়স, বেলোয়াড়ি কাচের মতো ভেঙে যাওয়া সুখের মুহূর্ত— সব ধরে দেবেন তিনি, ক্যামেরার ওপারের চোখ।

সাদাকালো পৃথিবীর মায়া রাস্তা। বড়ো নদী। ফ্রিল দেওয়া ফ্রক। দুই বেণী আর এলো খোঁপার পাশে, ব্রীড়াময় কালো প্যান্ট, সাদা জামার ধীমান যুবকেরা। তাদের শরীর ঘিরে উদাসী হাওয়া আর ছায়াবীথি কদমের ঘনঘোর।

একটু প্রস্তুতি। গভীর মনোযোগ। ক্যামেরার পেছনের শিল্পী তৈরি করে দিলেন, বিলীয়মান কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার আগে, আমদের সাদাকালো টলমলে জলছবি দিন ....

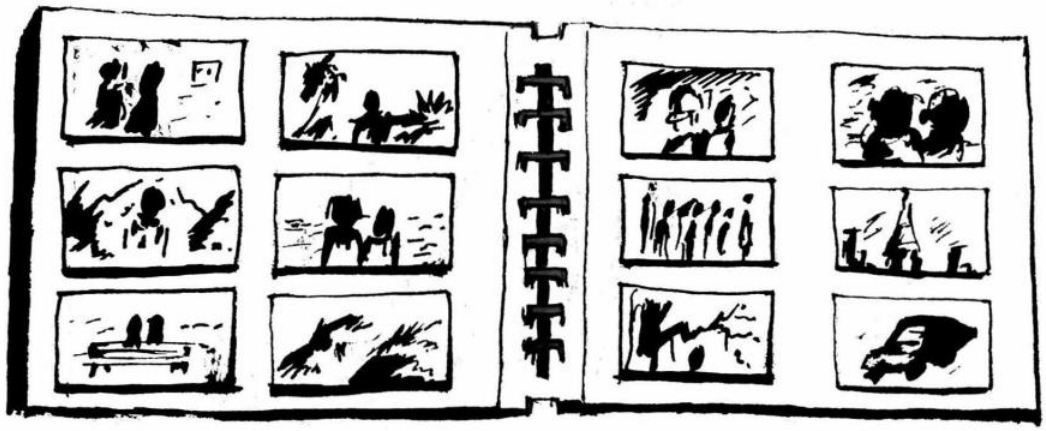

সম্পর্কের সাতকাহন

পাপড়ি ভট্টাচার্য

আমাদের চেতনার গহনে মন বুদ্ধি আর হৃদয়ের সংযোগে যখন নতুন সৃষ্টি উঁকি দেয় তখন দুচোখের তারায় ভেসে ওঠে যে কোনো সুন্দর সম্পর্কের কথা। সেই ভাবনার সাধনা ফুলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে আরও অনেক মানুষের চিন্তার কাছাকাছি হয় যখন তখন তা হয় সময়জয়ী।

সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে পাঠকের সবচেয়ে বড় মনন, বিচারকের সম্মুখীন হয় আপনা আপনি। পাঠক নিজেও বুঝতে পারেন না কখন তিনি আষ্টে পৃষ্ঠে ভাললাগায় ভালবাসায় জড়িয়ে যান লেখকের লেখার সঙ্গে। আর লেখক সংযুক্ত পাঠক সঙ্গতে সাহিত্যের তবলা বাজে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা কালে বলেছেন—'যেমন কুলী-মজুর' পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল ডঃ স্যামুয়েল জনসনকে কেন্দ্র করেও সেই রকম একটি বিদগ্ধ লেখকমন্ডলী গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। তাদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই লেখকগণ কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পাইয়ে দেওয়া সাহিত্যের সদর দরজার গুনগানে থেমে থাকেননি। বরং বুক ফুলিয়ে বলেছেন যে বঙ্কিম তাঁদের গড়ে পিটে তৈরি করেছেন লেখক হিসেবে।

নতুন লেখকদের উপকার হয় এমন বিষয় তিনি তাঁর লেখার স্কুলে আলোচনা করতেন প্রায়ই। তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই সময় একজন লেখকই আর একজন লেখকের শিক্ষক, শিক্ষিকার ছাত্র-ছাত্রীর সম্পর্ক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে লেখকের মননকে নানাখাতে প্রবাহিত করলে জ্ঞানে ও চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হবে তেমনই লেখকের মননও উপকৃত হয়। সামর্থ্য থাকলে যে কোনো ধরনের রচনাকেই শিল্পমান দিতে পারেন লেখক। নতুন লেখক লেখিকাদের জন্য তিনি একটি সবিনয় নিবেদন রেখেছিলেন সেকালে। একালেও সেটি পাঠে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না আশা করি।

(১) যশের জন্য লিখবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

(২) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।

(৩) যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন ... পরে সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

(৪) সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

এই যে লেখক লেখকের জন্য শিক্ষকের ভূমিকাটি নিয়ে সুন্দর সম্পর্কটি গড়েছিলেন বলেই না বাংলা সাহিত্য কত না সমৃদ্ধ হয়েছে। এখন একটা কথা বলা যায় একালের লেখকরা লেখককে কি তৈরি করেন। করেন না। চুপটি করে লিখে যান। অন্যকে সুযোগ দেওয়া দুরে থাক চেষ্টা করেন তাঁর উপর দিয়ে যেন কেউ যেতে না পারে। কাজেই দুপক্ষই বোঝেন কোন মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। দুএকজন ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। তবে কোনো কোনো লেখক মরীয়া হয়ে নিরলস চেষ্টা করে যান দয়া দাক্ষিণ্যের যশ পাবার। অথচ সে সময়টুকু লেখার পিছনে পড়াশোনার পিছনে খরচ করলে এক সময় তিনিও .... উপযুক্ত উদাহরণ তো সেকালের আমাদের রবীন্দ্রনাথ। পাঠক চিত্তজয়ী কালজয়ী। নিবিষ্ট অধ্যয়নে আর দিবারাত্রি লেখার অনুশীলনে এভাবেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সবশ্রেষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাঁকে চর্মচক্ষুতে না দেখেও। পরবর্তীতে আমরা কত কত সমৃদ্ধ হয়েছি অনেক ভাল ভাল প্রকৃত লেখকের সৃষ্টিশীলতায়।

বর্তমানকালের লেখকদের সময়ই বা কোথায় সম্পর্ক গড়ার? সত্যি কথা বলতে কি এখন কম্পিটিশানের যুগ। সবাই চান্স পেতে চান সর্বাগ্রে। কিন্তু একজন সু-লেখক প্রতিযোগীতা

ভিত্তিক লেখা দিতে চান না। একজন নবীনের ক্ষেত্রে ফেলে আসা পরীক্ষার দিনের ভীতি যেন ফিরে আসে। নির্ধারিত সময়ে লেখা শেষ করা। শব্দ সংখ্যা ঠিক রাখা। এত কিছু মাথায় রেখেই চৌকাঠ পেরোতে হয়।

ইদানিং দেখা যায় কবিতার ওয়ার্কশপ, গল্পের ওয়ার্কশপ। যাঁরা করেন তাঁরা ভালো লেখক প্রতিভা খুঁজে পাবার জন্যই করেন। এটা একটা ভাল দিকই বলতে হবে। তবে এটা মফস্বলেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় কিন্তু গড়ে ওঠে কেজো সম্পর্ক। এভাবে প্রকৃত লেখক প্রকৃত সম্পাদক বা প্রকাশক বা প্রকৃত পাঠক গড়ে ওঠে না। হৃদ্যতা শব্দটা এখন উচ্চারণ করতেও ভয় হয়। কেননা হৃদ্যতা সখ্যতা মানেই অন্য সম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী। তাই সম্পাদক প্রকাশক খুবই সতর্ক পা ফেলেন। কেননা সম্পর্কের সেতু ধরে অপাঠ্য লেখা ছাপতে বাধ্য হতে চান না।

ঠিক এ কারণেই সেকালে সমাজ ব্যবস্থা যেমনই হোক না কেন, লেখকরা কিন্তু মন খুলে নিবিষ্ট মনে লিখে গেছেন। লেখক সংখ্যা কম ছিল বলে তাঁদের শব্দ সংখ্যা নিয়ে ভাবতে হয়নি। মনের আনন্দ যন্ত্রনা পাতার পর পাতা লিখে গেছেন। যেমন খুশি লেখার স্বাধীনতায় উন্নত মানের লেখা আমরা পেয়ে গেছি। আরও জেনেছি লেখক এবং সম্পাদক বা প্রকাশকের সঙ্গে নিবিড় অথচ সম্মানীয় সম্পর্ক। এবং সেকালে তার উদাহরণ বলে শেষ করা যাবে না।

এখন প্রকাশক লেখকের কাছে আসেন না। লেখকরাই ফোন করে অ্যাপো করে যান প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা মহারাজার দাপট নিয়ে প্রকাশকরা কথা বলেন। লেখকের অর্থেই অনেক প্রকাশন সংস্থা এখন বড় বড় প্রকাশনের কাজ করছেন। আর নিজেদের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছেন। সু-সম্পর্ক দু-সম্পর্ক কোনটারই প্রবাহ নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তবুও যথাযোগ্য কপিরাইট কেউ পেয়েছেন শোনা যায় না।

যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে যে সব বড় বড় প্রকাশক বা পত্রিকার সম্পাদক লেখকদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখেন সেও পত্রিকার স্বার্থেই। বা বই ব্যবসার জন্যই। কারণ তারা বিজ্ঞাপনের অর্থে লেখক পোষেন। বলতে গেলে নাম হয়ে যাওয়া লেখকরা লিখতে অপারগ হয়েও লিখতে বাধ্য হন চাপে পড়ে। চার ভাগের এক ভাগ টাকা লেখকদের জন্য বরাদ্দ থাকে। বিজ্ঞাপনের বদান্যতায় অনেক ভুঁইফোড় লেখক লেখক হয়ে ওঠেন। আর কত ভাল ভাল লেখক হতাশ হয়ে লেখা ছেড়ে দেন। সে খবর একালের প্রকাশকরা কি রাখেন? রাখলে হয়তো সম্পর্ক শব্দটার মান মর্যাদা অনেক অনেক বেড়ে যেতো।

সাহিত্যের পাঠক বলতে আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ। বলতে গেলে লেখকদের জীবনে পাঠক সত্যদ্রষ্টা। সত্যিকারের পাঠকের কাছে খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যায় যাবতীয় ফাঁকি ও চালাকি। পাঠক মুখ ফেরালে সাধ্য কি প্রকাশকের মার্কেটিং করা।

কাজেই প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের অন্ন মধুর যে সম্পর্কই হোক না কেন পাঠক সমাজ বদলে বদলে যায়। কাল পরিবর্তনের মত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, রুচির পরিবর্তনও স্বাভাবিক। পরিবর্তনের ধারায় ধ্বনিত হয় নতুনের জয়ধ্বনি। কাজেই প্রথাসিদ্ধ পুরোনো অভ্যেস এবং ফ্যাসনেবল কিছু নতুন রীতি ও নাম যশ মিলে যে চিন্তার জট তৈরি হচ্ছে, তাতে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগের পথই রুদ্ধ হতে বসেছে। অথচ সেই স্বহৃদয় সম্যক আলোচনার পথেই পাঠক চায় লেখকের কাছে পৌঁছে যেতে। আর লেখকদেরও প্রত্যাশা, তাঁরা জানতে পারবেন পাঠক কীভাবে সাড়া দিচ্ছে তাঁর লেখায়।

আমাদের সাহিত্যে কিন্তু এই বিনিময়ের সুযোগ কিন্তু দিন দিন কমে আসছে। সাহিত্য যদি জননী হয় তো ভাষা হলো শিকড়। সেই শিকড়ে জড়িয়ে থাকতে চায় পাঠক আজীবন প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সে পাঠক সনাতন পন্থী হোক বা আধুনিক পন্থী। রসাস্বাদন ক্ষমতা তো একই। আর যুগে যুগে লেখক পাঠক সম্পর্কতো একই থাকার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা থাকছে না।

এরও একটা বড় কারণ ঐ সম্পর্ক আবার বেশি বেশি হলে। সভা সমিতি, গুনমুগ্ধদের প্রীতি, বাজারে জনপ্রিয়তা, পাঠক প্রিয়তা, এসব সম্পর্কও আবার লেখকের জীবনে দুর্বিসহ ভূমিকা নেয়। অতএব পাঠক প্রিয় হলেও পাঠকের কাছে অধরা লেখকের সাহিত্যই অনেক দিন স্থায়ী হয়। একবার পড়লেই যে লেখা শেষ হয়ে যায়, অর্থ উপার্জনের জন্যই বাজার চলতি লেখা, যার কাছে বার বার যাওয়া যায় না সেখানে কিভাবে তৈরি হবে লেখক পাঠক সম্পর্ক। গভীরতর বোধের মননের সম্পর্ক যে সাহিত্য পাঠের মূল ভিত।

লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন "আমার বরাবরের লড়াই তো আমার নিজেরই সঙ্গে। যা বলতে চাই, যেমনভাবে বলতে চাই তা পারলাম কিনা। ওই লড়াইটাই মারাত্মক, প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক ফেলে দিল, না বুকে তুলে নিল তা বড় কথা নয়। আমি আমার নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে লিখতে পেরেছি কিনা সেটাই আমার সমস্যা"। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়, লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেই দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিস্টকর হইয়া উঠে।

সময় বদলেছে তবু উপরিউক্ত কথাগুলি নবীন লেখকদের তো মানতে হবে।

একজন সহৃদয় প্রকাশকের কথা বলি। এই প্রকাশক মহাশয় অনেক লড়াইয়ের পথ পেরিয়ে একটি প্রথম সারির কাগজের প্রকাশক হন। একজন জনপ্রিয় কবিকে তিনি এবং পাঠক প্রিয়তার জন্য তিনিও মান্য করে 'কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করে দিলেন অল্পবয়সেই। আর সেই মগ্ন কবি ভেবে বসলেন' তিনি কবি অতএব ... নিজের শারিরীক কষ্টের কথা, অসুস্থতার কথা, চোখের সমস্যায় লিখতে কষ্ট হওয়ার কথা। লেখালেখির ক্ষতি হওয়ার কথা, এরকম নানা কারণ জানিয়ে চিঠি লিখতেন। সেই সহৃদয় প্রকাশক ভাবলেন আ-হা-হা কবির বড় কষ্ট। তিনি কবিকে ততদিনে খুব ভালবেসে ফেলেছেন, শুধু কবি বলে নয় মানুষ হিসেবে এবং অত্যাধিক স্নেহপরায়ণ বশত বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হবে ভেবে তিনি ছুটলেন ডাক্তারের পেছনে। কলকাতার ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশনার কাজ ফেলে কবিকে নিয়ে রওনা হলেন চেন্নাই। ওখানে অত্যাধিক উন্নতমানের শংকর নেত্রালয়ের চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে কবির কোন অসুখ খুঁজে পেলেন না। চশমার পাওয়ারও ঠিক আছে। ডাক্তাররা বললেন—ওঁর অসুখ মনে। তবু কবি মানতে চান না। বলেন কেন তবে মাথা ধরে থাকে।

প্রকাশক বুঝলেন কবির সমস্যা টেনশন। নাম যশ খ্যাতি পেয়ে হারিয়ে ফেলার ভয়। পাছে অন্য কেউ পেয়ে যায় এই আতঙ্কে সন্ত্রস্ত থাকলে মাথা ধরার রোগ তো হবেই। ডাক্তার বললেন কবিকে নার্ভের ডাক্তার দেখাতে হবে। সেই মত একদিন পর দেখানো হবে। সেই অবসরে প্রকাশক মহাশয় নিজের চোখ পরীক্ষা করিয়ে আশ্চর্য হয়ে জানলেন তাঁর চোখে গ্লুকোমা হয়েছে। প্রকাশক ভাবলেন যাক বাবা কবির কিছু হয়নি। কবিতা লেখার প্রতি কবির নিরলস সাধনা অব্যাহত থাকবে।

এমন উদারমতি প্রকাশক কীভাবে লেখক কর্তৃক সম্পর্কের জেরে নাস্তানাবুদ হলেন সেটা জানুন।

পরে এই কবি উপন্যাস লেখা শুরু করেই স্ত্রীর নাম করে টাকা চাইতে লাগলেন। নানা অসুখের অজুহাতে একেবারে টাকার অংকও বলে দিতে লাগলেন। দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি পাঠাতে লাগলেন।

শুভানুধ্যায়ী প্রকাশক সু-সম্পর্কের জন্য জিজ্ঞেসও করতে পারছেন না এত এত টাকা তাঁর কিসের দরকার। তাঁর স্নেহভাজন কবিকে প্রচুর টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তিনি ভুলেও ভাবেননি ওই টাকা ধার দেওয়া নিয়ে কোনওরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়বেন। যখন প্রকাশক মহাশয়ের অবসরের দিন এলো, তিনি ততদিনে কয়েক লক্ষ টাকা ধার দিয়ে বসে আছেন। এবার সব হিসাব মিটাবার পালা। তিনি সেই যস্বস্বী কবি মহাশয়কে বললেন—"তুমি যা টাকা নিয়েছ এবার শোধ দাও। টাকা তো আমার নয়, কোম্পানির, আমি কর্মচারী মাত্র।" কবি জবাবে বললেন "আপনি কর্মচারী হতে পারেন আমি তো কবি"।

এই প্রকাশক তবুও কবিকে ভালবাসতেন, সম্মান দিতেন বহু কাব্যগ্রন্থ, কাব্য সংগ্রহ উপন্যাস প্রকাশ করেছেন কেন? না তিনি কবি। তিনি সাহিত্যিক। অথচ মানুষ হিসেবে তিনি কেমন তা অনেকেই জানেন। প্রকাশও জানলেন, গভীরভাবে দুঃখ পেলেন ...

খুব বেশিদিনের কথা নয়। কিন্তু মাথা খুঁড়লেও এমন প্রকাশক এবং সেই বানিজ্যিক পত্রিকার সম্পাদক আর পাওয়া যাবে না। প্রকাশনার জগতে এঁরা সকলের শ্রদ্ধার। কিন্তু এখন? সম্পর্ক? লেখক খুঁজে বের করা? স্নেহ, ভালবাসা বন্ধুত্ব? সব সব যান্ত্রিক।

ইদানিং সম্পর্ক স্থাপন তো দূরের কথা অসৎ প্রকাশক ভুঁইফোড় লেখক, কাব্যযশো প্রার্থী হাজার হাজার কবি এঁদের নিয়ে চলছে কবি সম্মেলন বা সাহিত্য উৎসব।

প্রকৃত লেখক, প্রকৃত কবি নিভৃতে লেখেন কেউ কেউ হারিয়ে যায়। কেউ কেউ কোনো সম্পর্কের সুতো ধরে বন বন করে ঘুড়ির মত আকাশে ওঠেন। আর যদি কোনো নিভৃত বাসীনি লেখক জীবনে একটি মাত্র গ্রন্থ লিখেই বিশেষ পুরস্কার পেয়ে যান। তারপর তাঁর আর কোনো লেখা পাওয়া যায় না, সমস্ত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও। আমাদের বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে কি করে? ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু তাঁদেরও তো আজীবন নিরলস লেখক হতে দেখি না। নানা মিডিয়া নানা সংস্থা, সভা-সমিতি, উৎসবে রাজনীতির নেতাদের মত তাঁদের জীবন পাত্র উছলিয়া ওঠে। সময় কোথায় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার। প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টিশীল থাকার। তবে একটা সত্যি কথা হলো কবিতার ক্ষেত্রে পাঠক কবিতা পড়ে যেদিন নতুন করে কবিকে আবিষ্কার করে সেই দিনই কবির জন্ম তাঁর পাঠকের কাছে। বিশেষ দিনের সীমা পার হয়ে নতুনভাবে জন্ম নেন কবি। মৃত্যুর পরেও অমর হয়ে যান এভাবেই।

পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, অসম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, দিল্লী ও অন্যান্য প্রদেশ, সুদূর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের বাইরেও নানা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কবিতাকে কেন্দ্র করে লেখক-পাঠক একাত্মতার সম্পর্ক কিন্তু নিবিড়। এটা সম্ভব হয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের দৌলতে।

এই অবাণিজ্যিক শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্র-পত্রিকাগুলি বহু শ্রম-নিষ্ঠা-আন্তরিকতায় নিজেদের উপস্থাপনের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুস্থ সমাজ ও

সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখা পাঠক সমাজই এইসব পত্র-পত্রিকার সাহস ও সম্পদ। এটি একটি নানা ফুলে গাঁথা মালার মত লেখক, পাঠক, সম্পাদক এবং প্রকাশককে ভালো-মন্দ সব মিলিয়ে একটা সাহিত্য বন্ধনের সম্পর্ক বাঁচিয়ে রেখেছে।

অনেক সময় সু-সম্পর্ক ছাড়াই লেখার গুনে লেখার জগতে সুনাম অর্জন করেছেন বহু লেখক-লেখিকা, অথচ সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী একসময় বুদ্ধদেব গুহ-র লেখা প্রথমে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিলেন। পরে রবিবাসরীয়তে লেখা বেরোনোর পর পাঠকের উচ্ছ্বাস দেখে কবি সুনীল বসু চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালেন। রমাপদ চৌধুরী বললেন—'গল্প দিন, গল্প দিন'। এরপর পনের দিন অন্তর আনন্দবাজারে গল্প বেরোতে লাগল। তারপর থেকে প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল।

অতীতে বঙ্কিমচন্দ্রও এভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে অবজ্ঞা করেছিলেন পরে পরিচিত একজনের অনুরোধে লেখাটি পড়ে দেখলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শনের' নিয়মিত লেখক।

পরবর্তীকালে লেখক বুদ্ধদেব গুহ ক্ষোভে বলেছেন—"কিছু ব্যবসাদার সাহিত্যিক আমার লেখাকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়নি। কারণ তাতে তাদের বাজার পরে যেত। আমি বাংলাদেশের পাঠক মহলে ঢুকে পড়লে অনেক ক্ষতি হয়ে যেত ওদের। তাই প্রতি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি"। বুদ্ধদেব গুহ সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন—"বাংলার প্রকাশকরা ভালো নয়। শিক্ষিত প্রকাশক বাংলা প্রকাশনা জগতে প্রায় নেই বললেই চলে। যার বাজার আছে, বিক্রি আছে, ছাইভস্ম যাই লিখুক, তার লেখাই ছাপাবে তারা। বিজ্ঞাপন দেখে। আনন্দবাজার কিংবা দে'জ ছাড়া বেশির ভাগ প্রকাশকের দরবারেই স্বচ্ছতা বলে কিছু নেই। আমার মামা সুনির্মল বসু প্রকাশকের কাছে বই বিক্রি বাবদ একশো টাকা রয়্যালটি চাইলেন। পঁচিশ টাকা দিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন প্রকাশক। বাংলার বেশিরভাগ সাহিত্যিককেই একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।"

তাহলে বোঝা যাচ্ছে বর্তমানে লেখক প্রকাশক সম্পর্ক তৈরিই হয় না। পুরোটাই যান্ত্রিক। অতএব .... "পয়সা দিয়ে যাদের বই কিনতে হয় তাঁদের মধ্যে একটা বিচার বোধ কাজ করবেই। তাঁরা ভাল-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয়-অনপ্রিয় এসব বিচার করেই বই কিনবেন।" (সাময়িক পত্রিকা) আগেও বলেছি কিছু অর্থবান ব্যক্তি নিজের বই প্রতি বছরই ছাপিয়ে চলেছেন। সেই বই ছাপছেন যেসব প্রকাশক তাঁরাও বেশ নামি। সেই বই সর্বাঙ্গ সুন্দর হলেও দু-একটা লেখা পড়ে বিবমিলা জাগে। তাই পাঠক কখনই এসব বই কিনে ঠকতে চান না। ঠকেন বরং অনভিজ্ঞ আবেগ প্রবন কবি লেখক।

ইদানিং লেখকরা পাঠকদের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে তোলার জন্য একটা অদ্ভুত রাস্তা বাতলেছেন। আর সেই কারণে পাঠকের কাছে কেমন খেলো হয়ে যাচ্ছেন। মিডিয়ার দৌলতে অনেক নামি লেখক পাঠকের একেবারে চোখের সামনে, প্রথম চাক্ষুস দর্শনের আবেগ কাটিয়ে ওঠার পরে কেউ কেউ তাঁর লেখা পড়ার চেয়ে ব্যক্তিসত্তার পরিচয় জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। অনেক লেখক বেশ গর্বিত হয়ে সরাসরি পাঠকের জন্য নানা ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে থাকেন। মিডিয়ার মাধ্যমে বা মঞ্চে। আবার উল্টোচিত্র দেখা যায় বইমেলায়। পাঠক যখন বই কিনতে গিয়ে লেখককে দেখেন অবাক হন। কেউ কেউ খুশীও হন। নিবিষ্ট পাঠক কিন্তু তাঁর প্রিয় লেখককে দেখার চেয়ে তাঁরা তাদের মনজাত মননের ভালবাসা লেখককে বা কবিকে দুহাত ভরে মনে মনে দেন সেটা চাক্ষুষ দেখায় অনেক সময় আহত হয়। কোনো পাঠক ওই রহস্যটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চান প্রাণপনে। আর কমিউনিকেট করেন লেখার সঙ্গে। এখনও আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এই তৈরি সম্পর্কগুলো ততক্ষণই যতক্ষণ কাজের ক্ষেত্র বই ছাপাছাপি বা বাজারক্ষেত্র তৈরি করা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে মান্যতা দেবো পাঠককে। তাঁরা পাঠক আপাদমস্তক পাঠক। তাদের জোরালো সম্পর্ক লেখকের লেখার সঙ্গে। আর কোন কিছুতে নয়। একজন নবীন লেখকও আগে হন পাঠক। একজন সম্পাদক সম্পাদনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন পাঁচজন লেখকের পাঠক হয়ে। একজন প্রকাশক বই না পড়েও অনেক সময় ছাপিয়ে ফেলার পর দেখেন বই হু হু বিক্রি হচ্ছে। হয়তো তখনই তিনি সম্পাদককে বাহবা দিয়ে নিজের পাঠক চিত্তকে জাগৃত করেন। মোটকথা লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক যেদিন আমাদের দেশে সু-সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন সেইদিক পাঠক সমাজ অসম্ভব উপকৃত হবেন আশা করি।

পরিশেষে বলি, লেখকরা পাঠকের কাছ থেকে নানারকম ভালবাসার উপহার পান। কেউ নানা পদ রান্না করে পাঠায়। কই মাছ, ইলিশ, পিঠে পুলি থেকে শুরু করে কত কি। লেখক বলেন—তাদের জন্যই তো বেঁচে আছি। আর এক অজানিত পাঠক বইপাড়া থেকে একটি বই কিনে ট্রেনে পড়তে পড়তে যাচ্ছেন। তিনি জানেন না তাঁর সামনের সিটে বসে আছেন সেই বই-এর লেখক। ফেসবুকের লেখক বন্ধুরা বললো—আলাপ করলে না কেন? লেখকের উত্তর—'সংকোচ হচ্ছিল', এক্ষেত্রে আলাপ করলেই বরং ব্যাপারটা খেলো হয়ে যেত। তার চেয়ে সেই পাঠকের মগ্নতা এবং মুখের আলোছায়ার প্রতিক্রিয়া একজন লেখকের কাছে হার্দিক সম্পর্কের বড় পুরস্কার নয় কি?

লেখা শেষ করছি সমরেশ মজুমদারের "কইতে কথা বাধে" বই থেকে একটি প্যারাগ্রাফ তুলে নিয়ে।

"বই-এর ব্যাপারে একজন লেখকের ভূমিকা কী? এতদিন যা দেখেছি তা হল লেখক লিখবেন, প্রকাশক ছাপবেন, বিজ্ঞাপন দেবেন, বই বিক্রি হবে। অর্থাৎ লেখকের লেখা বই-এর ছাপা এবং বিক্রির ব্যাপারে প্রকাশকই যা করার করে এসেছেন। আমরা শুনেছি, এর ফলে অনেক লেখককে প্রকাশক বঞ্চিত করেছেন, লেখক প্রতারিত হয়েছেন। বেশি ছেপে কম বলা, বিক্রি হলেও হয়নি বলাটা একসময় কলেজ স্ট্রিটে নাকি স্বাভাবিক ছিল। আনন্দ পাবলিশার্সই প্রথম এ ব্যাপারে প্রফেশনালিজম আনল। প্রতিটি বইতে মুদ্রণ সংখ্যা ছেপে দেওয়া ছাড়া লেখককে বাৎসরিক বই বিক্রির হিসেব লিখিতভাবে জানিয়ে দিল। কিন্তু এর বাইরে বেশিরভাগ প্রকাশকই যতক্ষণ ভাল সম্পর্ক থাকছে এবং বই বিক্রি হচ্ছে ততক্ষণ লেখকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। অর্থাৎ কত বই ছাপা হচ্ছে, কী রকম বিক্রি হচ্ছে সে ব্যাপারে বেশির ভাগ লেখকই অন্ধকারে থাকেন। এ ব্যাপারের পরিবর্তন আমাদের আগের লেখকরা করতে পারেননি। তাছাড়াও একটি হাস্যকর পদ্ধতি প্রকাশকরা বহু যুগ ধরে আঁকড়ে রয়েছেন। কোনও মতে একটা বই ছেপে দেশ বা অন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এঁরা বসে থাকেন এই ভেবে হাজার হাজার পাঠক ছুটে এসে তাঁর দোকান থেকে বই কিনে নিয়ে যাবে। একমাত্র বইমেলাতেই প্রকাশক পাঠককে পান, অন্য সময় তাঁদের কাছে পৌঁছাবার কোনও চেষ্টাই করেন না। কলেজ স্ট্রীটের বই ব্যবসা এখনও মান্ধাতার আমলে, আধুনিকিকরণের কোনও চেষ্টাই নেই। একা আনন্দ পাবলিশার্স তো গোটা কলেজ স্ট্রীট নয়।"

তবে এইসব দিনও আমরা পেরিয়ে এসেছি। আধুনিকিকরণও যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু তাতে কি প্রকাশকরা কি লেখক নামক পরশ পাথর খোঁজেন? যদি খুঁজতেন তাহলে লেখার সময় নষ্ট করে, গাদাগুচ্ছ টাকা খরচ করে নিজের বই নিজে ছেপে সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রমান করার এত প্রয়োজন হত কি?

তবু লেখক স্বপ্ন দেখেন, কবি স্বপ্ন দেখেন, লেখক হয়ে ওঠার কবি হয়ে ওঠার। লিখতে যা ভাল লাগে লেখেন। মনে মনে ভাবতে থাকেন গীতার সেই শ্লোক— 'মা ফলেষু কদাচন'।

সাইবার সহচরী

তৃষ্ণা বসাক

অল দা নিউ জেন নামে একটি কম্পিউটার গেম আছে যার শুরুতেই খেলুড়েকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কে? পুরুষ, নারী না এর কোনটাই না (নাইদার)? উত্তরটি নাইদার হলে কোন সমস্যা নেই, দিব্যি খেলায় ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু প্রথম দুটি উত্তর দিলেই গণ্ডগোল। অনন্ত এক লুপে আটকে যেতে হবে অমনি, কিছুতেই খেলায় জায়গা পাবে না খেলুড়ে। মাঠ থেকে ফিরে আসতে হবে মন খারাপ নিয়ে।

এই খেলাটা কিন্তু কেউ নিছক মজা করার জন্যে বানায়নি, এটা একটি তত্ত্বের ফসল, যার নাম সাইবারফেমিনিজম। যাকে বলা যায় ইন্টারনেটের দুনিয়ায় নারীর নিজস্ব স্বর খোঁজার একটি উদ্যোগ। বাস্তব জগতের পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিপরীতে একটি বিকল্প লিংগনিরপেক্ষ সম্পর্কের সন্ধান। সভ্যতার শুরু থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যে অগ্রগতি, তার বিবর্তনের দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখব, সেখানে প্রথম কয়েক শতাব্দী জুড়ে কেবল বাহুবলেরই আধিপত্য। দানবিক চেহারার সব যন্ত্র, তা চালাতে প্রয়োজন পুংবল। মেয়েরা সেখানে নন—এন্টিটি। আমাদের শিল্পসাহিত্যেও তাই। যন্ত্র মানেই পুরুষ, যে শারীরিক বলে বলীয়ান, যার হাঁক ডাক প্রতাপ প্রচুর, প্রয়োজনে যে প্রকৃতিকে যথেচ্ছ লুণ্ঠন করতে পিছপা নয়। সে যেন 'মুক্তধারার' কারিগর বিভূতি, যার বাঁধ বিপন্ন করে চাষিদের জীবিকা, তবু বিভূতির গর্ব—মানুষের কান্নায় তার যন্ত্র টলে না। আর মুক্তধারার স্রষ্টা তো শিউরেই উঠেছিলেন ভারীশিল্প নির্ভর জাপানের দানবিক চেহারা দেখে। 'এ তো লোহার জাপান। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ দিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটাকে খেয়ে ফেলছে'। এই কায়িক শ্রম নির্ভর প্রযুক্তির জগতে মেয়েরা এতদিন ছিল ব্রাত্য, উদ্ভাবক হিসেবে তো বটেই, গ্রাহক হিসেবেও। কলের সঙ্গে মেয়েদের বরাবরের তাই ভাসুর ভাদ্দরবউয়ের সম্পর্ক। গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি'-র ঠাকুমা তাই দেশলাই কাঠিকে এড়িয়ে চলেন। হাওয়া কল বাড়ির অন্দরে উঁকি মেরে মেয়েদের আব্রু নষ্ট করছে—এই অজুহাতে হাওয়া কল তুলে দেওয়ার জন্যে মামলা করেন জনৈক গোকুল ঘোষাল।

কিন্তু চিরকাল তো এই ভারি চেহারার শ্রমনির্ভর যন্ত্র টিকল না, ধীরে ধীরে এল মেধানির্ভর প্রযুক্তি। রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে পুরুষালি বলের জায়গা নেবে নারীর ধী ও মেধা, ভারের বদলে আসবে ধার আর ভয়ংকর বিশালত্বের জায়গা নেবে স্বল্প আয়তনের সৌন্দর্য। 'একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্ম প্রণালী সহজ, মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্যবোধকে, ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে, সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্জভাবে লুব্ধ করে না, তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না, সে কাউকে বঞ্চিত করে বড় নয়। সে সকলের সঙ্গে সন্ধি করে বড়' বেগম রোকেয়ার লেখা বাংলা ভাষার প্রথম কল্পবিজ্ঞান 'সুলতানার স্বপ্ন'-এর নারীস্থানের সারার মুখে এর প্রতিধ্বনি—'কেবল শারীরিক বল হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না।'

এসব ভাবনা বাস্তবায়িত হতে সময় লাগল, কিন্তু হল। ধীরে ধীরে যন্ত্রের চেহারার পরুষতা কমে এল, অনেক যন্ত্রই চলে এল মেয়েদের নাগালে। আর এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল কম্পিউটার। সেলাইকল আর টাইপরাইটারের পর মেয়েরা যে যন্ত্রটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে। প্রথম আধুনিক কম্পিউটার এনিয়াক বসান ছিল কয়েকটা ঘর জুড়ে। অজস্র তার লাগিয়ে তাকে চালাতে হত। ভারি জটিল সেই কাজ। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজকের হাতের নাগালে ডেস্কটপ, ল্যাপটপে পৌঁছন। আর সেই কম্পিউটারের হাত ধরেই এল সাইবার ফেমিনিজম, সাইবার স্পেসের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক নিয়ে যে তত্ত্বের উদ্ভব।

যে মেয়েরা এতদিন কেঁদে ককিয়ে এক চিলতে নিজের ঘর পায়নি, তাদের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব এই সাইবার স্পেসের। সাইবার শব্দটি প্রথম পাওয়া গেল ১৯৮৪ সালে উইলিয়াম গিবসনের নিউরোম্যান্সার উপন্যাসে। আর সাইবার ফেমিনিজম শব্দটি প্রথম আনলেন অস্ট্রেলিয়ার ভি এন এস ম্যাট্রিক্স ১৯৯১ সালে সাইবার ফেমিনিস্ট ইস্তাহারে। এর সংজ্ঞা দিলেন ক্যারলিন গুয়ার্টিন—সাইবার ফেমিনিজম হচ্ছে অস্তিত্ব, লিঙ্গ, শরীর এবং প্রযুক্তির পারস্পরিক সংযোগ ও ক্ষমতার সমীকরণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে বুঝে নেবার একটি পথ।

আসলে যখন নব্বইয়ের দশকে কয়েকটি মার্কিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল ইন্টারনেট, তখন হাতের নাগালে কম্পিউটার ছিল যেসব মেয়েদের তারা নতুন এই ক্ষমতা-জংগ্মতার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। হাতে হাতে ধরাধরি করে তাঁরা হয়ে উঠলেন সাইবার-সহচরী। তবে এ ধরা স্পর্শাতীত আলিঙ্গনের মতোই। একই সঙ্গে আন্দোলন শুরু হল কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনে। এর প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র হল ১৯৯৭ সালে জার্মানিতে।

'মেয়ে মানুষের বিদ্যাচর্চা পাপ হতে পারে না, কারণ মা সরস্বতী নিজেই মেয়েমানুষ' বলেছিল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র সত্যবতী। তবু চিকনের উল্টোকাজের অন্দরের অন্ধকার দূর হতে চায় না। কি এদেশে, কি বিদেশে। এদেশে যদি কাঁথাকানি আর হাতাখুন্তি, ওদেশে তবে মোজা বোনা, পিয়ানো বাজানো আর পুডিং বানানো। শার্লট ব্রন্টির জেন আয়ার ভেবেছিল এইসব তুচ্ছ কাজেই কি শেষ হয়ে যাবে মেয়েদের জীবন?

এই হাতাখুন্তি আর উল কাঁটা থেকে ব্ল্যাকবেরি, মাউস—এই উল্লম্ফন কিন্তু একদিনে হয়নি। এর পেছনে রয়েছে দু-দুটো বিশ্ব যুদ্ধ, ইন্টিগ্রেটেড চিপ্সের উদ্ভাবন, দূর-যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি এবং নব্বইয়ের দশকে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণ, যার ফলে পার্সোনাল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ইত্যাদি অনেক সস্তা হয়ে হাতের নাগালে চলে এসেছে। যে মেয়েরা সুবর্ণলতার মতো পাশের বাড়ির বৌটার মুখটুকুও না দেখে বই চালাচালি করেছে দেওয়ালের ছোট্ট ফোকরের মধ্যে দিয়ে, তাদেরই বকুল-উত্তর প্রজন্মের কাছে কখন যেন কম্পিউটারের সীমায়িত চতুষ্কোণ বিকল্প বিশ্ব হয়ে গেছে। সাইবার স্পেস তাদের দিয়েছে নিজস্ব জায়গার উষ্ণতা, এতদিন কোন গ্যাজেটই যা দিতে পারেনি।

নেট ব্যবহারে ইউএসএ ও কানাডায় সার্বিকভাবে এগিয়ে আছে মেয়েরা, বয়সের বিচারে ২৫-৪৯ বছর বয়সী মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ইন্টারনেটে বেশি সময় কাটায়। ২৫-৩৪ বছর সীমার মেয়েরা ৫৫% সময় কাটায় নেটে। তবে ছেলেরা যেখানে অফিসিয়াল কাজকর্ম সারে, মেয়েরা বেশি আগ্রহী সোশ্যাল নেটওয়াকিং-এ। আর বিপদটা সেখানেই। সাইবার পর্নোগ্রাফির ফাঁদ শুধু নয়, টুইটার ফেসবুকে বডিশেমিং, ট্রোলিং-এর প্রধান লক্ষ্য মেয়েরা। সেলিব্রিটি থেকে সাধারণ গৃহবধূ-কে এর শিকার নয়? তবে এর থেকেও বড় বিপদ মনের। সাইবার স্পেসের সুবিধেগুলোই অনেকসময় বিপদ ডেকে আনছে। এই প্রথম এমন একটা মঞ্চ পেয়েছে নারী, যেখানে তার লিঙ্গ পরিচয় গৌণ। সে নারী না পুরুষ, বৃদ্ধা না যুবতী, ধনী না নির্ধন, শ্বেতাঙ্গ না কৃষ্ণাঙ্গ—সমস্ত ধরনের আত্মখর্বকারী পরিচয় গোপন রেখে সে এখানে শুধু একটা আইকন। নিজেকে আড়াল রেখে সে খেলে যেতে পারে মায়ার খেলা। এ খেলার রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু মুশকিল হল বাস্তব অবাস্তবের টানাপোড়েনে তৈরি হচ্ছে নানা জটিলতা, বিভ্রান্তি এমনকি মনোবিকলনও। ডিজিটাল পার্সোনালিটি নারী পুরুষের প্রেম ও যৌনতায় নিয়ে আসছে প্রত্যাশা ভঙ্গের ঝুঁকি। সম্পর্ক ভাঙছে। ভেঙেচুরে যাচ্ছে সামাজিকতা, টান পড়ছে সংস্কৃতির শিকড়ে। ভার্জিনিয়া উলফ বলেছিলেন লেখক হতে গেলে নিজস্ব রোজগার ও নিজস্ব ঘর চাই মেয়েদের। এখন জন্মালে তিনি নিজস্ব নেট কানেকশনও যোগ করতেন এই তালিকায়। তাঁর আরও একটা কথা মনে পড়ছে।

Women have served all these centuries as looking glass possessing the magic and delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size.

পুরুষকে দ্বিগুণ মাপে প্রতিফলিত করতে অভ্যস্ত সেই নারী কি আজ আবার মুক্তমঞ্চের নামে আটকে যাচ্ছে না নতুন আরও জটিল এক আয়নায়?

খুলে দাও লক গেট

স্বাতী গুপ্ত

আদিম অরণ্যভূমি প্রতি মুহূর্ত বিপদ সংকুল একা মানুষ সে বোঝে পেটের খিদে আর নিরাপত্তা। সৃষ্টির শুরুতে প্রতিটি মানুষ ছিলো একা। এরপর গোষ্ঠী দল গড়ে ওঠে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান আর যৌনতা এই হলো প্রাথমিক চাহিদা। সম্পর্কের ভিত্তি। বহু পথ পার করে আজ সম্পর্ক একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষের জীবনকে একটা শৃঙ্খলা দিতে আদিমতা থেকে সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সম্পর্ক নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। কবে কোথায় কিভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হলো ইতিহাস জানে সেই কথা। আজ আমরা জানি সম্পর্ক জন্মগত, সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক আর বাকী অর্জিত। আর প্রত্যেকটি সম্পর্কের একটাই দায়বদ্ধতা নির্ভরতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস। বিশ্বায়ণের যুগে বাইরের দেশ গুলোতে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান-এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমানে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের এই সমাজের একটু উপরের দিকে তাকালে বা নতুন প্রজন্মর এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস আস্থা বা এর প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে মনে হয়। এখন একা মাই একটি শিশুর জন্ম দিয়ে বড় করে তুলতে পারে পিতৃপরিচয়-এর প্রয়োজন নেই। আইনত। তবুও সমাজের কিছু প্রাচীন স্থুল মানসিকতায় এই সম্পর্কগুলো আঘাত করে। নতুনকে সব সময়েই একটা লড়াই-এর অবজ্ঞার মধ্যে দিয়েই জায়গা করে নিতে হবে। যেমন কিছু শতাব্দী আগে প্রেমজ বিবাহ নিষিদ্ধ বলেই মনে করা হতো কিন্তু বর্তমানে সেগুলো স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিছুটা পেছনে ফিরে তাকালেই দেখা যায় অসবর্ণের বিবাহ নিয়ে সমাজের বিধিনিষেধ আর এক ঘরে করে দেওয়া। আজকের দিনে এগুলো অতি সাধারণ স্বাভাবিক। অর্থাৎ সম্পর্কর লক গেট গুলো খুলে গেছে। আরো সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত প্রতিটি সম্পর্ক। কিছু সম্পর্কের নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে যেটা লঙ্ঘন করা নাকি পাপ। প্রশ্ন জাগে এই সীমা দাগ কেটে ছিলো মানুষই একদিন নিজের প্রয়োজনে সমাজের প্রয়োজনে। এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানও সম্পর্ক গড়ে তোলে। কর্মক্ষেত্রেও এক ভিন্ন পরিবেশে সম্পর্ক। আর কেবল মানুষে মানুষে নয় এই প্রকৃতির সাথে এক অভিন্ন সম্পর্ক আদিম মানব শিশুর। একটি নবজাতক যখন জন্মায় বর্ণ গোষ্ঠী ধর্ম জাতি কিছুই তাকে দেখে বোঝা যায় না। কর্মসূত্রে দেখেছি মায়ের হাতের নম্বর বাচ্চার হাতেও থাকে আর এটাই সম্পর্ক। শিশুর ধর্ম জাতি হয় না। সে সম্পর্ক বোঝে যে মাতৃস্তন পান করায়। তাকেই চেনে গায়ের গন্ধে।

আজ আমাদের সভ্যতার রথ অনেকটাই এগিয়ে এসেছে কিন্তু আমরা কি সম্পর্ক গুলোর মূল্যবোধ ধরে রাখতে সঠিক অর্থে পারছি। নাকি বহু বছর ধরে এই সম্পর্কের সীমারেখায় আবদ্ধ সমাজে এবার এক নতুন আলো চাইছে। যেখানে প্রতিটি সম্পর্ক স্বেচ্ছায় গৃহীত হবে কোন সম্পর্ক বোঝা হয়ে বয়ে চলতে হবে না আজীবন। লেসবিয়ান এবং গে যারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে বহুকাল। প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকা উচিত। নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টিতে কবিতার যেমন পরিবর্তন ঘটছে ঠিক তেমনি সমাজের পরিবর্তনও ঘটে চলেছে, ধীর এই পরিবর্তন। সম্পর্কের স্থায়ীত্ব কতটা সময় সেটা বিবেচ্য নয়। যতোটাই হোক সম্পর্কের মাধুর্য্য যেন বজায় থাকে। তিক্ততা যেন সম্পর্ককে জীবনের বোঝা করে না তোলে। প্রতিটি নদী উৎস থেকে নির্দিষ্ট গতিপথে মোহনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দু'পাড়ের ইতিহাস হাসি কান্নার স্তূপাকার বোঝায় কখনও নদী বালুচরে গতিহারায়। তবুও প্রতিটি নদীর একটা নিজস্ব দাগ আছে। তেমনি সম্পর্ক প্রত্যেক সম্পর্কের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে ঠিক যেমন ফুল বাগানে হাজারো ফুলের আলাদা সৌরভ প্রতি সম্পর্ক ঠিক তেমনি নিজস্বতায় ভরপুর।

অ-সমীকরণ

অর্ণব মণ্ডল

মানুষ তার নিজের সমাজে সামাজিক, আর তার এই সমাজ বয়স, বুদ্ধি, লিঙ্গ, ধর্ম এমন আরও ব্রাত্য বহু বিষয়ে স্তরিভূত। এইসব সামাজিক শর্ত আর ব্যক্তিগত পূরণ মেনে নিয়ে বামপক্ষের সাথে ডানপক্ষের মিলে যাওয়াই হল সম্পর্ক। যা কিছু অজানা তা কে জানা বিষয়ের মেলবন্ধনে খুঁজে পাওয়া যায় 'সম্পর্ক'-এর মধ্য দিয়ে; শুধু বামপক্ষ আর ডানপক্ষের যথার্থতার ঠিক থাকাই বাঞ্ছনীয়। 'সম্পর্ক'-এ কোন অব্যয় নেই তবে প্রত্যয় আছে, নিজের ছন্দে সুর বানানোর স্বস্তি আছে, তুই-তুমি-আপনি এই সর্বণামগুলি ব্যবহার করার ব্যাকরণ আছে। যে 'সম্পর্ক' একটি বিশেষ্য পদ, মৌখিক পরীক্ষায় আসে, তা অনেক সরল। কিন্তু সম্পর্ক যখনই ক্রিয়াপদ তখন সেটা জীবন যাপন হয়ে ওঠে।

এই দুনিয়ায় যতরকমের রোগ আছে ততরকমের সম্পর্ক আছে। 'সম্পর্ক' অনেকটা ঠিক কেন্নোর মত, একটু আঘাত পেলে নিজেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আর তাই যে কোন নতুন 'সম্পর্ক'-কে প্রথমে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হয় নয়ত সে ততদিন গ্রহণযোগ্য নয়, অনেকটা ঠিক নতুন দেবদেবীদের ধরাধামে প্রতিষ্ঠা করার মত। কিছু সম্পর্ক একমুখী, কিছু বহুমুখী, কিছু স্বীকৃত, কিছু বিকৃত, যা পাওয়া যায় না তা পাওয়ার অধ্যাবশয়, তাকে প্রমাণ করার জেদে গড়ে ওঠে একটি সম্পর্ক। 'সম্পর্ক' কোনোভাবেই একজন মানুষকে সাহায্য করে না নিজেকে জানতে। তবে সম্পর্ক দরকারি, কারণ সম্পর্ক আনন্দ দেয়, পূর্ণতা দেয়, ছায়া দেয়, পিছুটান দেয়, পরিচিতি দেয়—অনেকটা ঠিক একটি সাদা কাপড়ের টুকরোয় সুঁচের কাজ যেমনভাবে কাপড়টিকে আসনের মর্যাদা দেয়। সম্পর্ক মূল্যের একনিষ্ঠ দাবিদার, জীবনের বাঁকগুলোয় সম্পর্ক মূল্যবান হওয়ার দাবী করে, স্বীকারোক্তি চেয়ে বসে, আত্মত্যাগ অস্বীকার করে দেয়। কিছু সম্পর্কের মূল্য দেনমোহরে ঠিক হয়। তিনবার স্বীকারে উপস্থিত আবার তিনবার অস্বীকারে গায়েব। সম্পর্ক যখন কেবলমাত্র স্বীকার নির্ভর হয়ে পড়ে তখন সে পঙ্গুত্ব পায় আর তখন কিছু সম্পর্ক হয় বেতাল, কিছু শনি, কিছু যাবজ্জীবন।

ফুসফুস অক্সিজেন চায় আর আত্মা সম্পর্ক। আত্মার সাথে শরীরের সম্পর্কটাও শুধুমাত্র অনুলোম বিলোমের সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা। অনেকগুলো সম্পর্ক পরপর সজ্জিত হয়ে এক একটি মৌলিক নক্সা গঠন করে। মানুষ সেই সব নক্সা চিনুক বা না চিনুক, বুঝুক বা না বুঝুক সে সর্বকাল সকল সম্পর্ককে তকমা দিতে উৎসাহী। রবি-র সাথে ঠাকুর, ওয়াশিং পাউডারের সাথে নির্মা-র মতই অবৈধ শব্দের সাথে সম্পর্ক শব্দটাও অনেকটা সাইলেন্ট সাবকনসাসে ঢুকে গেছে, আর এটা মানুষ হয়ে আমাদের দুর্ভাগ্য। মানুষ সম্পর্কজাত কিন্তু সম্পর্ক কখনই মানবসৃষ্ট নয়। এই সম্পর্ক স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, যে সম্পর্কের ভূমিকা কোনো প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করে না, তা স্বতঃসিদ্ধ। সূর্যের আলোয় যে যে সম্পর্ক প্রতিনিয়ত গড়ে ওঠে তার প্রতিটিই সত্য হওয়ার দাবি রাখে কিন্তু মানুষের সেই সত্য অব্দি পৌঁছানোর কোনও দায় নেই।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দুটি কবিতা

কখন এসেছি ছুটে

অদ্ভুত স্পন্দনে জেগে আছি
অথচ কোথাও কোনো বিকার লেগে নেই
এই মসৃণ ত্বকের নীচে যেটুকু উষ্ণতা
তারই লোভে কখন এসেছি ছুটে
কিছু মনে নেই

নিরীহ ভাবনা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার
কোনো শেষ নেই
মনে হয় যে কোনোদিন বাইরে বেরিয়ে পড়ি
ছুঁয়ে দেখবো জল
যেখানে তিরতির জল বয়ে যায়
ফুলেশ্বরের রাঙামাটি ছুঁয়ে

এতটা বাস্তব ভেবেছোকী কখনো
কখনো কী কাছে এসে বলেছো—চলো না বেরিয়ে পড়ি

ভালো আছি

ভালো আছি রোজ রোজ দেখা হলে একই কথা বলি
ভালো আছি দুঃখ ও বেদনা নিয়ে দিন উচাটন
ভালো আছি ভীষণ তুমুল এক আকাঙ্ক্ষায় ভিজে
ভালো আছি সৃষ্টি সুখে শস্যদানা তুলে এনে ঘরে
ভালো আছি একা ঘর শোকে দুঃখে চিরজাগ্রতের
ভালো আছি তৃষ্ণার মোহ নিয়ে একা বসে থেকে
ভালো আছি অসময়ে দূরে রেখে চিরুনীতল্লাসি
ভালো আছি ফিরে এসে মিরুজিন নদীটির কাছে
ভালো আছি মুহূর্তের চারশো চল্লিশ ভোল্ট নিয়ে
ভালো আছি দূরে রেখে গোপনতা সব কথা বলে
ভালো আছি নির্জনতা একা একা হেঁটে বহুদূর
ভালো আছি এখনো জড়িয়ে সেই শরীরি বিদ্যুতে

জহর সেনমজুমদার

গদ্য কবিতা

বাবা

আমাদের জীর্ণ শীর্ণ ভিটে ছাড়া আর কি আছে তুমি বলো; দাঙ্গায় নিহত বাবা মাঝে মাঝে কালো অন্ধকারের ভেতরে এসে দাঁড়ায়; মা রান্না করতে করতে করতে পিছু না ফিরেই বলে—তোর বাবা এসেছে; পা নেই, তবু এসেছে; হাত নেই, তবু এসেছে; আমরা চোখ বড়ো বড়ো কোরেও দেখতে পাই না; ছুটতে ছুটতে নদী পাড়ে যাই; মনে হয়, নদীর ওপর, জলের মাঝখানে, কেউ যেন বসে রয়েছে; পা নেই, বসে রয়েছে; হাত নেই, বসে রয়েছে ... অস্পষ্ট, আবছা ... অস্পষ্ট, আবছা ...

মা

আমাদের ইস্কুল গাছতলায়; কালবৈশাখীর ঝড় উঠলে ছেঁড়া ছেঁড়া বইখাতা উড়ে চলে যায়; মাস্টারও গালে হাত দিয়ে শুধু চুপ কোরে বসে থাকে; মাটিতে নুইয়ে আসা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমরাও বোকার মতো হাত দিয়ে ঝড় ধরবার চেষ্টা করি; হাত দিয়ে কি সত্যিই ঝড় ধরা যায়? কালবৈশাখীর ঝড় উঠলে মা খুব ভয় পায়; এই বুঝি খুঁটি ভেঙে চালা উড়ে যাবে; আমরা সবাই মাকে জড়িয়ে ধরি; তারপর গোঙাতে গোঙাতে বলি, মা মা, চিন্তা কোরোনা, এই দেখো, আমরা মুঠোর ভেতর ঝড়টাকে ধরে ফেলেছি, ও আর কিচ্ছু করতে পারবেনা; মা কিচ্ছু বলেনা; শুধু ভাঙা টেঁকির ওপর ভেঙে পড়া কলা গাছটাকে অবাক হয়ে দেখতে থাকে ... দেখতেই থাকে ... কলাগাছটা কি আর কখনো উঠে দাঁড়াবে না? আমরাও ভাবতে থাকি; শুধু ভাবতেই থাকি ...

দিদি

গাছ তলার ইসকুলে প্রায়ই দেখাতাম, মাস্টার দিদিকে ডাঁশা পেয়ারা দিচ্ছে, আমাদের নয়; আমরা চাইলেও কখনো একটাও পেয়ারা পেতাম না; মা মাস্টারকে পছন্দ করতো না; একদিন বঁটি নিয়ে তাড়া করতেই মাস্টার জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়লো; গাছতলার ইসকুল উঠে গেলো; কিছুদিন পর, কাউকে কিছু না বোলে, দিদিও জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলো—আর বেরোলো না; দিন আর রাত্রি, রাত্রি আর দিন, আমরা শুধু জঙ্গলের চারিপাশে ঘুরি, আর উদ্ভ্রান্তের মতো চেয়ে থাকি জঙ্গল চেরা সরু পথটির দিকে; একটাও ডাঁশা পেয়ারা গড়িয়ে আসেনা; মাস্টার আর দিদি কি ওই জঙ্গলের ভেতরেই আছে? ডাঁশা পেয়ারা খাচ্ছে? জানিনা জানিনা; এরপর আমরা আর কিচ্ছু জানিনা ...

পরিবারতন্ত্র

বাবা ভালোবাসে বকুলগাছ মা ভালোবাসে জবাগাছ দিদি ভালোবাসে টগরগাছ; আমাদের গ্রামে এই তিনটি গাছই নিজেদের মতো কোরে যথাস্থানে আছে; দাঙ্গায় বাবা নিহত হবার পর, দেখতাম, মা কেমন উদাস চোখে বকুল গাছের দিকে তাকিয়ে আছে; জঙ্গলে দিদি চলে যাবার পর, দেখতাম, মা বারবার টগরগাছের খুব কাছে গিয়ে বিড়বিড় কোরে কী যেন বলছে; জোনাকি ভর্তি সন্ধেবেলা, মাঝে মাঝে, মা ফিসফিস কোরে আমায় বলতো, একটা বকুল এনে দিবি? একটা টগর এনে দিবি? মা ভালোবাসে জবাগাছ; কিন্তু জবাগাছের দিকে মা আর ফিরেও তাকায়না; জোনাকি ভর্তি সন্ধেবেলা, জবাগাছ থেকে শুধু একটি জবা, টুপ কোরে মাটিতে খসে পড়ে; কোথাও কিচ্ছু হয়না—এছাড়া কোথাও কিচ্ছু হয়না; শুধু একটা মনখারাপ আমাদের গ্রাম থেকে ক্রমশ নদীর দিকে চলে যায় ...

সুদীপ চট্টোপাধ্যায়

তান্‌হা

১

চোখের নীচে একটা বাসস্টপ—
অপেক্ষার পূবদিকে সে দাঁড়িয়ে

একটা শহর শুধুই ঋতু খাচ্ছে, খাচ্ছে আস্ত একটা কলোনি

তোমার ছায়া থেকে উঠে এল তোমার বিবাহ
সে এখন কোনও হলুদ ট্যাক্সির জন্য বেরিয়ে পড়বে

টিকিট জমিয়ে জমিয়ে একটা ভ্রমণ তৈরি করতে চেয়েছিলে
যদিও, ছায়াপথের সামান্য অংশ ছাড়া, রাস্তাগুলো তোমার কেউ ছিল না

২

ঘুম তো চতুষ্পদ। কখনো তোমার পোষ্য ছিল
জিভ বাড়ালেই ঝরত ঘাম
তেমন গ্রীষ্মগুলো, এখন, ক্যালেন্ডার থেকে ঝরে
সেইসব অপেরাসঙ্গীতের কাছে গেছে
যাদের গলার ভেতর মাইল মাইল অন্ধকার
আর ফাঁকা একটা পানশালায়, এত রাতেও, কেউ বসে আছে
যদি নেশার ভেতর, হঠাৎ, একটা চক্‌মকি জ্বলে ওঠে

অমিত চক্রবর্তী

সম্পর্ক

১

সম্পর্ক নেই তবু একটা সম্পর্ক আছে সেইটা সুমধুর
যেমন বাতাসের সাথে ফুলের আর সেই আঘ্রাণে
কিংবদন্তির ঘরের পর্দা জুড়ে অশান্তি শুরু হয়ে যায়
ভিতরটা বাইরের সাথে পায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

২

সমুদ্রের সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ক সবথেকে গভীর
সূর্যের শোষণ প্রক্রিয়ায় ছোটে বাষ্পযান মেঘদূত
আলোকসংশ্লেষে পাতার সঙ্গেও মহোৎসব গভীর
তথাপি বিচ্ছেদ ঘটে যায় আবহাওয়ার কারণে

৩

ধর্মের গুহায় ঢুকলে সূর্য প্রতিবন্ধী হয় সেই কারণে
পকেট সাইজ বইগুলো ফ্রীতে দিলেও কেউ নেয়না
দল ভেঙে দল হয় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে আছে এক কথা
পার্থক্য কোত্থেকে সংগৃহীত সেটা না লেখার কারণে

৪

সন্তান প্রসবের সংবাদ পেয়ে বাবাকে প্রণাম করলে
বৈদ্যুতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তিনপুরুষের মধ্যে
কোথা ছিল আদি বাসস্থান কিংবা অনাদিরও আদি
ক্রমান্বয়ে এইভাবে দেখলে অসম্ভব কিছুটা ধরা যায়

৫

সবচেয়ে দূরের জিনিসকে যখন কাছে দেখা যায়
তখন যা নিয়ে আছি তার ফাটলগুলো ধরা পরে
আমার মুখগুলোই আমাকে বিশ্রী ভাবে মুখ ভেঙায়
বুঝতে সক্ষম হই ফেলে এসে ভুল করিনি উদ্ধারে

ঊষসী ভট্টাচার্য-এর দুটি কবিতা

মায়া

ধুতি পাঞ্জাবির লোক দেখলে,
আমার বড্ড মায়া হয় বাবা
তোমার কলেজ যাওয়া
পাট ভাঙা আলমারির গেরস্ত ঘর
ঝুঁটিবেলার অফুরন্ত দৌড়ের ধাক্কা পাড়
কাপড় কাচার দিন,

সেদিনের ঝোলা ব্যাগে
ঝুলে গেছেন সাম্মি কাপুর,
রফি গাইতে গাইতে
ফিদা হয়ে গেছেন।

সিনিয়র সিটিজেন মাত্র দুটো?
আমার বাবা একজনই হয়,
ধুতি পাঞ্জাবি বিরল হলেও
সাময়িক নয়।

এখনো আমার বড্ড মায়া হয় বাবা,
যে ঘামে সাদা পাঞ্জাবির হাতা ভিজে যায়
সেখানেই তুমি ভেসে ওঠো

এই অদ্ভুত গ্রীষ্ম কবে যাবে বাবা?
আমরা আবার বৃষ্টি মাখবো।

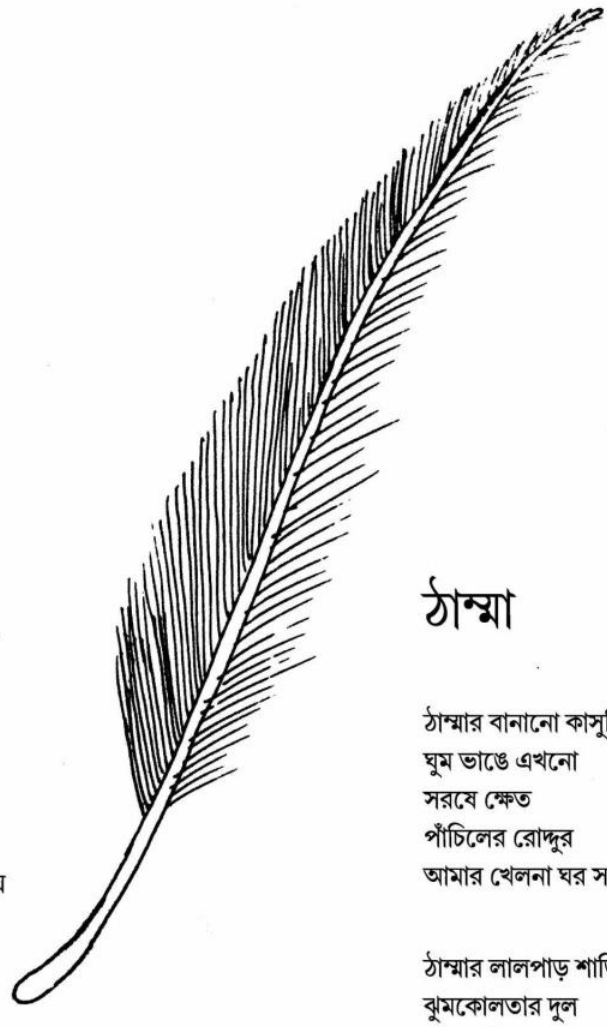

ঠাম্মা

ঠাম্মার বানানো কাসুন্দির গন্ধে,
ঘুম ভাঙে এখনো
সরষে ক্ষেত
পাঁচিলের রোদ্দুর
আমার খেলনা ঘর সাজিয়ে দেয়।

ঠাম্মার লালপাড় শাড়ি,
ঝুমকোলতার দুল
মনে করিয়ে দেয়,
ফেলে আসা ড্রয়িংখাতা

একেকটা সকাল
ঠাম্মা হয়ে আসে

কোনো কোনো রাত,
শববাহী গাড়ি।

সত্যব্রত সিন্‌হা

অমলতাস

অমলতাস, তুমি হলুদ সোনাঝুড়িতে জ্বলে উঠেছো—নির্জনে ঘুমিয়ে থাকা—নিষাদ জঠর থেকে। পাতার মৃদঙ্গতালে, নীল জোছনায়, স্বপ্নের সওদাগর হাওয়া। তুমুল শ্রাবণের অকালবোধন হাঁস-বালিকার স্বচ্ছ ডানায়। জঙ্ঘা বিহারে সপ্তপুরীর অন্বেষণে আমি হারিয়ে গিয়েছি, পললের গহীনে।

সন্ন্যাসব্রতী আমি, হিরণ্যপ্রভা, তোমার রূপের মহড়া ...

ছাতিমের স্রোতগন্ধে ভেসে যায় আলোকলতা। ষোলোকলায় নেমে আসে উর্বশী চাঁদ।

পিয়ালী বসু

বহু প্রতীক্ষিত জীবনবাদ

যেটা বললেই হয়
সেটা সময়বিশেষে না বললে
সম্পর্কের চেতনা নির্মাণের শেষ সিঁড়িটি
মৃদু ফেদার টাচে অতর্কিত বিসর্জন ঘোষণা করে

বহির্মুখী অন্বেষণ এবং ভাবনার প্রতিটি পদক্ষেপ
চিন্তনের গভীর ত্বকটি ছুঁয়ে ফেললেই ...
আয়ুযোগ্য হয় বিস্মৃতির রাজত্বকাল

সময়ের তূরীয় ফ্ল্যাশ শটে ... সহানুভূতির ক্লিশে পর্দাটি সরে যাওয়ার পর
শীতঘুমের আড়াল থেকে উঠে আসে শত সহস্র ঘৃণা-অক্ষর ভ্রুকুটি

দৃশ্য সরে ...
শতাব্দীর নিঃশ্বাস জমে থাকা ঘরটায়
ভালবাসা আলো খোঁজে ... করতলগত সংখ্যারেখা পেরিয়ে

জয়ীতা ব্যানার্জী গোস্বামী

সম্পর্ক বিষয়ক

জানলার বাঁ পাশে আলমারি
আলমারি ঘেঁষা ছয় বাই সাতের কাঠামো ডিঙিয়ে
সম্পর্ক মুখ রাখে আয়নায়
শার্টের ভাঙা বোতামের কাছে ঘরে ফেরার ঠিকানা জানতে চায়
অথচ তোমার স্লিপিং পিলে আর কোন অপেক্ষার এলিমেন্ট নেই

এশিয়ান পেইন্টের সাথে ম্যাচিং পর্দা
আর পর্দার আড়ালে ম্যাচ ফিক্সিং
এটুকু শিখে নেওয়ার পর সম্পর্কের আর বিশেষ কিছু থাকে না জানার

শুধু সেদ্ধ ভাতের গন্ধে রোজ চাপা পড়ে যায় যেসব ফসলহীন জমি
তাদের চোখে জেগে থাকে পাওয়া অথবা না পাওয়া বৃষ্টিদিন

শাশ্বতী নাথ

একক কবিতা

১

প্রতিবার নিঃশ্বাস ছুঁয়ে, আদর জড়ানো মন নিয়ে
আমরা কেমন ভেবে নিই, আমরা শুধু আমাদেরই,
ভয় পেয়ে জাপটে ধরি আরও, অধিকার নিই ঝালিয়ে,
আমরা জানি, নিজেকেই চেয়েছি, বারবারই;
শুধু স্পর্শেরা বদলেছে সময়ের নিরিখে,
আমরা জেনেছি প্রেম, বদলানো তারিখে।

২

আমার বড়ই টানাপোড়েন যাচ্ছে আজকাল,
প্রায় নুন আনতে পান্তা ফোরানোর উপক্রম,
যতটুকু যা ধার নিয়েছি তোমার থেকে,
তা কবে গিয়ে শোধ করে উঠতে পারব জানিনা,
বা আদেও পারব কিনা।
তার উপর তুমি দেনা বাড়াচ্ছ,
দিনের পর দিন, সপ্তাহ থেকে মাস,
কারণে-অকারণে, রাত থেকে দিনে,
তাই সাবধানে চলি, কোনোদিন যদি ঠোকাঠুকি লেগে যায়;
ভয় হয় খুব, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় শুনেছি,
স্বভাবের অভাব পড়বে না তো?

সুমনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাস

১

শিশিরের সাক্ষাৎকার নিতে
অনেকটা বয়স পেরিয়ে গেছে
তবুও সমুজ্জ্বল ভোরে
সবুজের চিকন গালিচায়
তার সাথে দেখা হলে বলি
তোমার কৈশোর নিয়ে
এসো কিছু কথা বলি সঙ্গোপনী ছাঁচে
দুদন্ড জিরানোর লোভে
তুমি ও কি অন্ধকার চেয়ে গেছো মনে?
ঔজ্জ্বল্যের সীমিত পাহারায়
কতটা কুড়িয়ে নাও সুখের পালক?
ক্ষয়ের নামতা ভেঙে ভেঙে
তোমারও কি শ্লথ হয় ঠোঁট?
খুলে বসো আবেগী জানালার পাশে
অব্যক্ত অভিমান জড়ো করে?

২

অভিমান গুড়ো হয়ে ঝরে
ঝরে বুঝি গোপন অভিলাষ
মানুষের ভিতরে ভিতরে
থাকে না কি
আবহমানের ইতিহাস

পাঠকের চালে কেউ নির্বোধ সাজি
কেউবা হাতড়ে খুঁজি শর্তাধীন অভিধান
কতটা সহজ হলে বোঝা যায় বলো
সুখ হল জীবনের বাসির বাগান

শোভন মণ্ডল

সহায়

পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে
মাথার আকাশ সরে গিয়ে
শরীরের অর্ধেকটা ঢুকে যাচ্ছে কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে
সমস্ত উদ্ভিদ, অর্কিড, প্রজাপতি
আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে
চলে যাচ্চে স্কচ, হুইস্কি, আঙুর-বাগান
একরাশ নিসর্গ, আলোর ওম
আমাকে ফেলে মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের চাঁদ
শীতের উষ্ণতা, মনোরম ঈশ্বর-কণা
নেই নেই নেই আর দিঘির জল
সুরভিত জ্যোৎস্না-মায়া

সবাই হারিয়ে যাচ্ছে একে একে
নির্লিপ্তভাবে সে-সব সহ্য করছি আমি
শুধু প্রেম! তুমি যেন ছেড়ে যেওনা
এক মুহূর্তও!

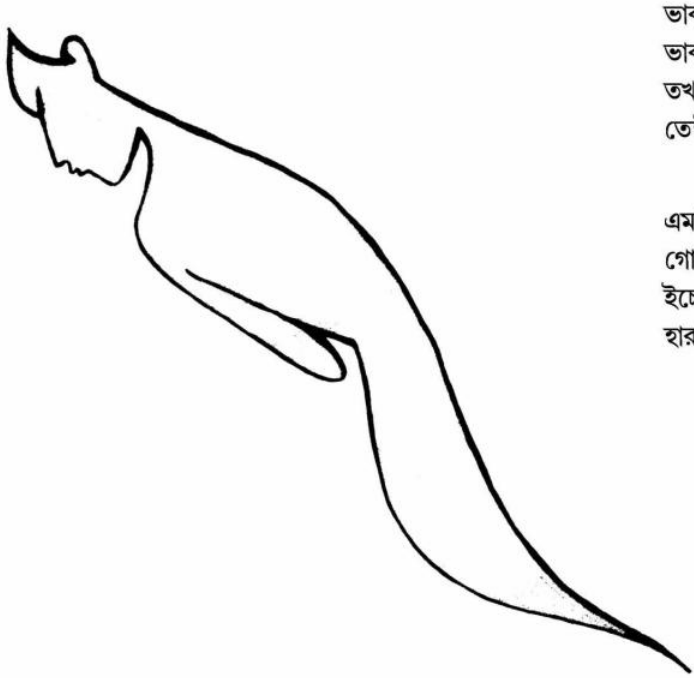

কাজরী বসু

মাটি

আকাশ ছোঁয়ার অসাধ্যসাধনে
মুছতে থাকি মাটির জন্মদাগ
নাগাল পাবার আগেই অন্যমনে
কখন যেন ফুরোলো সংরাগ ...

কখন যেন ঝড় চেয়েছি, তাই
হাত ছাড়িয়ে কামরাঙা রঙ মেঘ
মান অভিমান একটানা ধরতাই
বাড়ছে অনাবৃষ্টিরও উদ্বেগ

শিকড় যখন মর্মভেদের পথে
অগ্রগামী, বাড়িয়ে দিলাম হাত
চলতে থাকা একলা ভবিষ্যতে
জন্ম জন্ম শিখর পক্ষপাত

ভাবছি আমি, বৃষ্টি মেঘের ঘরে
ভাবছি না যে রইল কোথাও ভিত
তখন আমার গোপন চরাচরে
তেষ্টা গভীর, একটানা, নিশ্চিত

এমনি করে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ
গোপন শিকড়, একান্তে মর্মর ...
ইচ্ছে যদি অনন্ত উড্ডীন
হারায় যদি শিখর অতঃপর।

আবদুস শুকুর খান-এর দুটি কবিতা

আত্মপ্রত্যয়ে দাঁড়াও যদি

সকল বল্কল খুলে দাঁড়াও
সব ছিন্ন করে প্রগাঢ় সম্মোহনে চলে যাব
অযুত বছর চলতে থাকবে এই খেলা—
দেয়া-নেওয়ার ছাড়া
শূন্যতার দিনে সব পূর্ণ করে যাব—
যা আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, তাও।

সব আবরণ সরিয়ে সামনে দাঁড়াও
পূর্ণ করে দেখি,
সকল আশ্চর্যের মধ্যে যুক্ত করো আলো
দেখবে, নতুন সূর্যের দিকে ডানা মেলে
উড়ে যাচ্ছে সেই পাখি
যার ছড়ানো ডানায় মুক্তি লেখা আছে।

যে আছে অঞ্জলি পেতে
তাতে পরিপূর্ণ করে দাও, অনন্ত নৈঃশব্দ্যের কাছে।

অস্পষ্টতার ভিতরে

কোথাও কোনো অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে
সেই অনুধাবনহীন ছন্দের দিকে আমার মনযোগ
ক্রমে স্থির হতে হতে ভেঙে পড়ছে
সহসা পোড়ো বাড়ি যেমন ভেঙে পড়ে।
এত জীবন কেনই বা আমি
ওই শব্দের দিকে ধাবিত হচ্ছি
কেনই বা অনুধাবনহীন অস্পষ্টতার কাছে ধরা দিতে
প্রাণান্তকর অবস্থা আমার
কেন যে কবিতার শব্দেরা সরল সহজ বৃষ্টির মতো
ঝরে না, কেন
ওই অস্পষ্টতার ভিতরে মৃদু ধ্বনি হচ্ছে, মনে হচ্ছে
একদিন আমিও
সমস্ত স্পষ্টতার ভিতরে অস্পষ্ট হয়ে যাব ...

পারমিতা চক্রবর্তী

তারা ঘরে ফেরার আগে

চৌকাঠ পেরিয়ে যায় আঠারো'র লম্ফের আলো
কোথাও তৃষ্ণার্ত কাক বসে থাকে
ইলেকট্রিক তারে
কোথাও মোমের আলোয় সাজে
ড্রইংরুম কিংবা অ্যাটাচড বাথ
মার চোখে তখন প্লাস্টার খসা স্বপ্ন
ছুটকির পড়াশুনো, বাবা'র বুকের টিবি

দাদা তখন ম্যাট্রিকুলেশন
ভালোবাসা'র খুচরো পয়সা দিয়ে
কলমির আঁটি, হিংচের দঙ্গল
করে সাফ

রাত ভোর চলে সেলাই মেশিনের আওয়াজ
হাঁড়ির জল ফুটেফুটে যায় মরে
মহেন্দ্র দত্ত'র ছাতা জোড়তালি দিয়ে
বাবা বেরোয় চৌরাস্তার মুখে
রুমালে রক্তের দাগ লাগে,
নাকে, মুখে
ঘুমন্ত কপাট বন্ধ হয়ে থাকে আজও

ভাস্কর সেন

ভালোবাস

অন্ধকার ছিঁড়ে আলোকে নিয়ে লেখার
কথাছিল মেয়েটির।
অনেক রাতের আকাশে উড়ে যাওয়া পাখিটি
বলেছিল,
ফিরে আসব তোমার কাছে।
তপস্যার অন্ধকারে মেয়েটি প্রতিদিন বুকে রাখত
একটি করে নতুন ভোর।
বিষাদ রঙের তুলিতে আঁকা স্বপ্নগুলো গুছিয়ে
রাখত মিষ্টি হাসি নিয়ে।
অনেক অনেকদিন আগে ভগ্ন ভোরের শেষে
সভ্যতা প্রশ্ন করেছিল,
ভালোবাসা কাকে বলে?

ইচ্ছেনদীর ঢেউকে সাথী করে বিপন্ন সন্ধ্যায়
মেয়েটি বলেছিল,
অন্তহীন শূন্যের মাঝে দেবত্বের প্রদীপ জ্বালিয়ে
রাখাকে ভালোবাসা বলে।

মানালি চক্রবর্তী

আদর

তুমি যে আমায় পাগলি, ক্ষেপী, হনুমন্তী
আরও কত কী নামে ডাকো;
ওগুলো সব আমাকে আদর করে।
সব আদরে শরীর থাকে না ...

মন খারাপের দিনে কাউকে কিছু না বললেও
হঠাত তুই ফোন করে বলিস
'তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি ...
খারাপ স্বপ্ন, ভালো লাগছে না ...
চলে তোকে খাওয়াই ...'
তুই খাওয়াস, আমিও খাই
আদর ...
সব আদরে শরীর লাগে না ...

যখন দেরী হয়ে গেছে বলে
দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই,
তুমি আমার পেছন পেছন
আস্তে আস্তে আসো;
দেখ আমি রাস্তা পার হওয়ার সময়
তাড়াহুড়ো করি কি না ...
ওটাও আদর,
সব আদর শরীরে থাকে না ...

সব 'তুই' আর 'তুমি'দের ভালোবাসা
আদর হয়ে যায় ...
চোখ মুছিয়ে দেয় ...
গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ...
মাঝে মাঝে একটা গাছ কে জড়িয়ে ধরি,
মনে হয় ও শ্বাস নিচ্ছে ...
হাওয়ায় হাওয়ায় জাপটে ধরছে আমাকে ...
আদর,
শুধু শরীরে লাগে না ...

গল্প

তিন সঙ্গী

সাধন চট্টোপাধ্যায়

১

শ্রীমতী নিবেদিতা চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার অসীম দত্ত সময় দিয়েছেন চেম্বারে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দশটা। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে আজ অনেকগুলো ডকুমেন্ট পেতেই হবে। তালিকাটি ছোট নয়। শুরুর দিকে চিকিৎসার একটি প্রেসক্রিপসনে 'চ্যাটার্জ্জীর' বদলে 'চট্টোপাধ্যায়'—বীমা দপ্তর আপত্তি জানাতে পারে নইলে, ফিট সার্টিফিকেট নিতে হবে। আজকের দিনটি মিলিয়ে বিগত তিন দিনে ডাক্তার যা ফিস নিয়েছেন—লিখিত প্রমাণপত্র। গতকালই বিকেলে কাটাছেঁড়াগ্রস্ত স্তনটি থেকে রস গড়িয়েছিল—ভয়ের কিছু সম্ভাবিত কি না জিজ্ঞেস করতে হবে। নাকি সুগার থাকলে স্বাভাবিক এমন হয়।

অপেক্ষা!

অপেক্ষা!

অপেক্ষা!

ডাক্তারেরই অনুমোদিত নার্সটির রোজকার ড্রেসিংপর্ব শেষ; দিন তিনেক ধরে, যখন শুকিয়ে যাচ্ছে, নিবেদিতাকেই হাতে করেনিতে হয়। ব্যথাটাও কমার মুখে, তবে হঠাৎ রস গড়ালো কেন? হাতে হাতে ভুলচুক হচ্ছে কি? কাটাছেঁড়াতো মাসখানেক গড়ানোর মুখে। আগামী কালের মধ্যেই বিমাদপ্তরে দাবিপত্র না পৌঁছে দিলে, খরচা উশুল বিশবাঁও জলে। ওদের হাজার বাহানা। চল্লিশ হাজার গাঁট খরচা ইতিমধ্যে করতে হয়েছে। নতুন আইনে, গ্রাহককে খরচা করতে হবে, ডকুমেন্টগুলো যথাযথ দপ্তরে পৌঁছে দিলে তবেই কর্তৃপক্ষ ঝেড়ে কাশেন। ডাক্তার দত্ত আজ বাকিবকেয়া সবকিছুর দায়মুক্তি করে দেবেন। অপেক্ষা।

ভয়ঙ্কর ঠান্ডা, শীতের কট্টর দিনে, গুদামঘরের মতো চেহারাটার বেঞ্চে এখন শ্রীমতী নিবেদিতা। অনেকগুলো খুপরি, সারা দিনের সময়চক্রে, বহু ডাক্তারের চেম্বার।

নিবেদিতা গরম শাল, সোয়েটারে গুটিসুটি। গতকাল পারদ সাত-য়ে নেবেছিল।

আজ ভোর থেকেই আকাশে নাই-সূর্যের হু হু উত্তুরে বাতাস। চাবুক কষছে যেন।

স্তনটি লালিয়ে, টনটনে পুঁজ ক্ষতে যন্ত্রনা দিচ্ছিল। ছুরি চলেছিল। সুগার ছিল বলেই একদিন লাগল। পুঁজের রিপোর্টটাও দেখিয়ে নিতে হবে। ডাক্তার অবিশ্যি খারাপ সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু কাগজ দেখে রায় দেবার পর ষোলআনা স্বস্তি। নইলে ঘুণের মতো, বুকের নারকোল-টিতে কোড়ানি চলতেই থাকে—যদি অমুক ... যদি তমুক ... সংসার .... ছেড়ে যাওয়া ... গোপন দীর্ঘশ্বাস। ঘরটা যেন বরফের গুদাম হয়ে সময় জমিয়ে রেখেছে। নিবেদিতা ক্লান্ত হয়ে, বারবার তালিকাটা পড়ে জানতে পাল্লেন সারা দিনে নানা সময়ের চক্করে মোট আটাশজন ডাক্তার আছে। এবার হাইতুলে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের ডিগ্রিগুলো পড়ে সময় কাটাতে থাকেন।

নিবেদিতার সঙ্গে স্বামী-ব্যক্তিটি। একবার ঘর, একবার হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়াচ্ছেন। কেয়ার-টেকার মহিলাটি জানান, ডাক্তারের নাকি ঈষৎ বিলম্ব হতে পারে। কালই জানিয়েছেন তিনি। হায়! ব্যতিক্রমটি আজই? তাঁর কপালেই? শীতকালে কোনওমতে নিত্যকর্ম সেরে, ঘরে তালা দিয়ে, চুক্তির অটোতে এসেছেন। গাড়িটা বড় রাস্তার পাশে নির্বিঘ্নে কাগজ পড়ছে। সময়ের মিটার যত বাড়বে, চুক্তির মূল্য বাড়বে। ভেবেছিলেন কাজ সেরে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারবেন। কাজের মেয়েটা, রান্নার বউটা তালা দেখে ফিরে যাবে এরপর। গতকাল রাত দশটায় ফোনে ডাক্তারের সম্মতি মিলেছিল।

দশটা! সোয়া দশ। সাড়ে দশ! স্বামীব্যক্তিটি চাপা উত্তেজনা হতেই একবার গুদামঘর, পর মুহূর্তের অটোড্রাইভারের কাগজে চোখবোলানোর কাছে। উত্তজনায় মাথা ঘোরে, ছিঃ! নিজেকে বোঝাও। শান্ত থাকা দরকার। দুনিয়ায় টেনশন যত কম, তত দম!

অপেক্ষা!

অপেক্ষা!

অপেক্ষা!

ঘড়ি পৌনে এগারোটায় পৌঁছল। শান্ত থাকা দরকার, গুদাম সদৃশ্য ঘরটায় রোদ্দুরের আভাস নেই। বেঞ্চগুলো লোহার। দশ মিনিট পরপরই নিবেদিতার সিনিয়র সিটিজেন স্বামীটি লম্বা শ্বাস ফেলছেন। হেট টেল করছেন—ডাক্তার আসবেন তো আজ।

যতবার তাপের মোড়কে সিনিয়র মানুষটি জানতে চান, চেয়ারের মহিলাটি ততোধিক শীতল নির্বিকারে ছোট্ট মাথা নাড়ান। যেমন দেড় ঘন্টা ধরে নড়াচ্ছেন।

আশংকায় নিবেদিতা স্বামীর উদ্দেশে চোখ পাকান। শাসন করেন। ঘরের লোকটির স্বভাবটি তার তো চির-চেনা।

ব্যস্ততা একটা অসুখ। অপেক্ষাই একমাত্র অবলম্বন। নিবেদিতা হেলান দিয়ে চোখ বোজার ভান করেন। স্বামীটি নীরবে গজগজ করে বাইরে রোদের খোঁজে যান। এগারোটা! এগারোটা পনেরো-সাড়ে এগারো। স্বামীটি ফের গুদামে দেখেন, চেয়ারের মহিলাটি আবছা স্থিরচিত্র। নিবেদিতা যেন দরজা ভেজিয়ে নিজের ঘরে, ভেতরে কেবল নাক ডাকার শব্দ।

স্থির ছায়াচিত্রটিও আধোঘুমে।

অপেক্ষা!

অপেক্ষা!

অপেক্ষা!

একটা ফোন এল। জরুরি ব্যস্ততার কারণে হাজির হতে ডাক্তার দত্ত আজকের পরিবর্তে আগামীকাল দিন ধার্য করেছেন। স্বামী ব্যক্তিটির মধ্যে আর রাগ বিদ্বেষ নেই। কেবল ঘুম ভেঙে নিবেদিতা চেয়ারের ছায়াচিত্রটির কাছে জানতে চাইলেন, কালও কি সকাল সাড়ে ন'টায়?

উনি মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে হ্যাঁ-এর চিহ্ন জানালেন। নিবেদিতা কাগজমোড়া পুঁজ-রিপোর্ট হাতে এমন নিশ্চিন্তে বাইরে এলেন, যেন কোনও খেদ নেই। যে-কোনও নিবেদনের আশায় দীর্ঘ অপেক্ষার কোলে দোল খাওয়াই হচ্ছে জীবন। তরতাজা স্বাভাবিকতা!

২

ছুটে গিয়ে আশ্রয়। দোকান ঘরটায় বাড়তি চালাটির নীচে। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে নেমে পড়ল কিনা। দেখাদেখি টু-হুইলারটাও ঝটপট—ঝকঝকে নতুন মডেলের। ছেলেটি লাফিয়ে ঢুকে পড়ল। অচেনা মুখ। বিশ বাইশ বছরের সদ্য তরুণ যুবক। গাড়ির বডিটা ভিজছে। বৃষ্টির জল পড়ে ছিটকোচ্ছে। খুব সহজে ব্যাজার দশা থামবে না। মেঘ ও বিদ্যুৎ ভালোভাবেই জড়াজড়ি, ফাটাফাটি করে এসছে। অথচ দুপুরের তাপ-হাঁশফাঁশ পরিবেশে এমন সমস্যা অপ্রত্যাশিত ছিল। তালে এমন জরুরি কাজ হাতে বেরোতাম না। কী করি! বৃষ্টি ধরছে না—ধরছে না—ধরছে না। অথচ সন্ধ্যার আলো অন্ধকারে পথের উঁচু-নিচু গাঁট গণ্ডের জল ছিটিয়ে, চার চাকাদের গতির ক্ষান্তি নেই। নীরবে চার-পাশটায় তাকানো ছাড়া উপায় কি। দেখি, ছেলেটার স্বাস্থল হাতের পেশিতে নীলচে রঙয়ের ট্যাটু। জল ছাপের মতো চিত্তির-বিচিত্তির। পুরো হাতটায় নয়। বাইসেফ থেকে কনুই অবধি। ইদানীং চল দেখছি। পুরোনো ধারণায় অবরে সবরে পুলিশ বা জওয়ানদের হাতে নামের আদ্যাক্ষরটা ফোটানো দেখতাম। এখন চকচকে ম্যাগাজিনে ছবি সহ কুষ্টি-ঠিকুজি লেখা দেখতে পাই।

কত নিল ভাই? ট্যাটু করাতে? হাসিমুখে রসিক সেজে জিজ্ঞেস করলাম। যেন আধবুড়ো বয়সে আমারও শখ চেপে বসেছে। একজন কনজিউমার হয়ে গেছি।

পাঁচ হাজার! ছেলেটি বল্ল। ভেতরে ভেতরে আক্কেল গুড়ুম আমার।

সময় লাগে?

দু-ঘন্টা।

কোনও ব্যথা-বেদনা?

কৌতুহলীটি আধবুড়ো হলেও, ছেলেটি সাগ্রহে জবাব দিল, যারা জিম করে, পেশিগুলো শক্ত আর ডেভেলপ, তাদের একটু ব্যথা লাগবে। নইলে কম!

চাইলে এটা তুলেও ফেলা যায়?

যায়। তখন খরচা পঞ্চাশ হাজার। সময় লাগবে দশমিনিট। লেজার অপারেশন করতে হয় কিনা।

ব্বাঃ! আমি প্রযুক্তির জয়গানে দেখানো বিস্ময়ে বলি, ক্রিকেটার কোহ্‌লির হাতে দেখেছি! ছেলেটি উৎফুল্ল হাসিতে বলে, ওদেরগুলো বেশি দামের!

তা-ই?

শখ হল করলাম! বলুন? হেসে ছেলেটি হাল্কা কৈফিয়ৎ গোছের জবাবের পর অনেকক্ষণ হাসিটির মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ করে রাখল। চাবি লাগিয়ে গাড়িটার শরীর মুছে, হেলমেট চড়িয়ে ছোট্ট 'বাই' গোছের ইঙ্গিতে চলে গেল। আকাশের জল ধরতে চলেছে।

ঘন্টা খানেক বাদে, নিজের দরকারগুলো সেরে, ঠান্ডা আবহাওয়ায় ফিরতিপথে দেখি চালাটা ফাঁকা। ওখানেই অথচ দু'জন দাঁড়িয়েছিলাম। পলক সময়ের আগে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে, হাজারও হঠাৎ বৃষ্টিতে আমরা আর মুখোমুখি হব না। ছেলেটা ট্যাটুর শখ কি আজন্ম ধরে রাখতে পারবে? তখন হয়তো লেজার অপারেশনে খরচা উঠবে এক লাখ, সময় হয়ে যাবে কয়েক পলক মাত্র। উন্নততর প্রযুক্তিতে যেমন হয়! একটা বুদবুদ ফাটবার আগেই কাজ সেরে দেবে।

নতুন কোনও ছেলেটি আসবে। ফ্যাশন-ভোগ্যা বসুন্ধরায় ক্রমাগত বুদবুদের মতো শখের বৃষ্টি ঝরানো হবে। হাজার, লক্ষ, মিলিয়ন ডলারের। ক্ষণিক পরিচয়ের তরুণটির বদলে—পৃথিবী জুড়ে কালো, বাদামি, হলুদ—নানা বর্ণের হাতের পেশিগুলো কেবল বদলে বদলে যাবে।

৩

রাজামশাই বণিকটিকে বল্লেন, চার প্রহরের গল্প! গল্প কিন্তু থামানো যাবে না। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত! বণিকটি হাত জোড় করে নিবেদন করল, আপনিই তো থামবার হুকুম দিয়েছিলেন?

কখন?

সেই আমার ইলেকট্রিক নাগরদোলায় চেপে যখন আকাশের মাথায় চক্কর খাচ্ছিলেন? গোনা চক্করের আগেই থামতে হুকুম করলেন? সুস্থ বোধ করছিলেন না?

থামাও নি তো! রাজামশাইয়ের হাসি লুপ্ত হল।

বণিক আতঙ্কে বলল, আপনার প্রধান অমাত্য লোভ দেখিয়েছিল না-থামাতে। ষড়যন্ত্র! তার গর্দান কাটা গেছে। রাজামশাই বল্লেন।

বণিক ভয় পেল। রাজামশাই কোনও গোপন সিদ্ধান্ত যেন নিয়ে ফেলেছেন। অথচ বণিকের কাছে অতিরিক্ত কোনও গল্প ছিল না। কৌশলে সূর্যের অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

বণিক বল্ল, রাজামশায়, আপনি কি সিওর? বেইমানের গর্দান কাটা গেছে?

মানে?

মাপ করবেন, আমি যে সভার মধ্যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি?

সকলে নড়েচড়ে বসল। রাজামশাই অবধি। সকলের হৃৎপিণ্ড ছলাৎ ছলাৎ। ভয় ও সন্দেহে আক্রান্ত। রাজামশায়ের হুকুম হল বণিকের উদ্দেশে, শনাক্ত করে দাও! কে বেইমান? নইলে ...

বণিক বল্ল, তুচ্ছ এক বণিক আমি।... রাজামশায়ের আদেশ নিয়ে বলছি, সভাপদ সকলেই উঠে দাঁড়ান ... যে বসে থাকবে, তিনিই সে।

ঝপাঝপ সকলেই উঠে দাঁড়াল, এমনকী স্বয়ং রাজামশাইও। দেখা গেল, পড়ে আছে কেবল ছোটো মাঝারি—সর্বোচ্চ গদিটি। ক্ষমতা!

রাজামশাই বুঝে নিলেন প্রকৃত বেইমান কারা।

বাইরে সূর্যের আলো লুটিয়েছে।

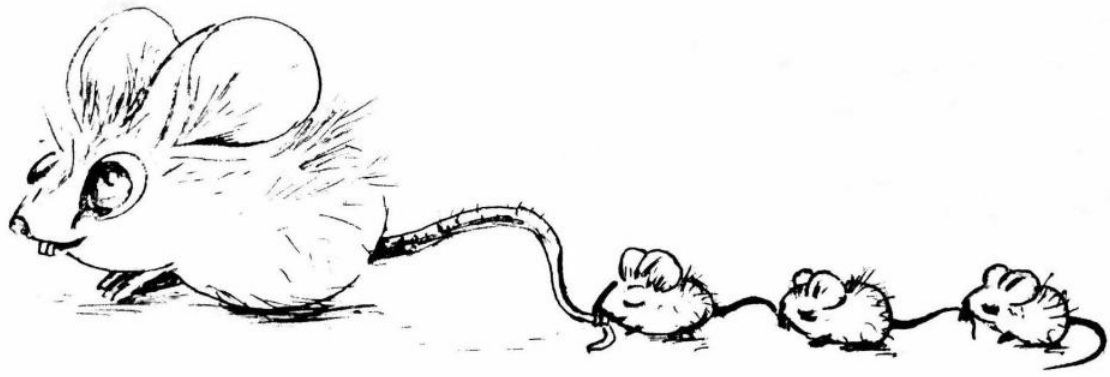

খই জীবন

অনিল ঘোষ

কিছুদিন ধরে উপীনের কাছে যাব-যাব করছিল ধেনো। আজ যাই কাল যাই করে যাওয়া আর হচ্ছিল না। গতকাল নাড়ু ঘোষের কাছে খারিজ হয়ে যেতে ব্যাপারটা আর ভাবনায় নয়, একেবারে প্রাণের দায়ে ঠেকেছে। এখন উপীন ছাড়া আর গতি নেই ধেনোর। রাখতে হয় রাখবে, ফেলতে হয় ফেলবে। একদিন উপীনই তো ছিল ওর অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা। আর এখন সে-ই অগতির গতি। মন চলো উপীন নিকেতনে।

এক বছর আগে, বলা নেই কওয়া নেই উপীন দুম করে হাওয়া হয়ে যায়। একদিন ভোর রাতে সে উঠে বসল। ছেঁড়াফাটা ঝুলঝাল্লি পোশাকটা গায়ে চাপাল। তারপর ঘরের আগল খোলার আগে ধেনোর দিকে ফিরে বলল, আমি যাই, বুইলি ...!

এমনভাবে বলল, যেন কাছেপিঠে কোথাও যাচ্ছে, ফিরে আসবে এখনই। ধেনো তবু ঘুমচোখে জিজ্ঞেস করেছিল, কনে চললে ও কা—?

বাইরে থেকে জবাব এসেছিল, ঘরখানা তোর রইল, বুইলি—।

ধড়মড় করে উঠে বসেছিল ধেনো। এক লাফে বাইরে এসে দেখেছিল কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। উপীনের কোনও চিহ্ন নেই। ধেনো অনেক ডেকেও তার সাড় পেল না।

সেই যে গেল উপীন, আর ফিরল না। তারপর কেটে গেছে এতগুলো দিন। অনেক খুঁজেছিল ধেনো। পথে-ঘাটে, সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব জায়গায়। চেনা-অচেনা কত মানুষকে জিজ্ঞেস করেছিল। নাহ্, উপীন যেন সত্যিই কুয়াশা হয়ে গেছে। ধেনো আজও ভেবে পেল না, উপীন এমন কাণ্ড করল কেন? নাকি এটাই ওর রীত!

রীত কথাটা উপীনের কাছে শুনেছিল ধেনো। অর্থ জানত না। উপীন বলত, মানুষের কত রীত-কীত, তা জানলি মহাভারত হয়ি যাবে রে—।

উপীন মানুষটা ধেনোর কাছে এক রহস্যময় পুরুষ। ওর কথাবার্তা, আচার-আচরণের কোনও তল কখনও পায়নি ও। শুধু ও কেন, এই ইটিণ্ডার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ—সকলের কাছে উপীন এক আজব প্রাণী। যদিও সবাই ওকে ভালোবাসত খুব। তাই, এমনভাবে উধাও হয়ে যেতে ধেনোকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে সবাই—কীরে, উপীন গেল কেন রে, ঝগড়া করেছিলি নাকি!

জবাব দিতে দিতে ধেনোর মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। ও কী করে বোঝাবে, কী হয়েছে! ধেনো নিজেও কি বুঝেছে! সত্যি এ এক রহস্য বটে।

অবশ্য রহস্য ভেদ করার মতো মাথা নয় ধেনোর। চার হাত শরীর। রোগা-সোগা পাকাঠি মার্কা। কালোকুলো শরীরটা একটা হাড়-চামড়ার খাঁচা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুলোর মতো দাঁত বেরিয়ে আছে বাইরে। খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি মুখ থেকে দাঁত বেরোলে পুরাণের কোনও রাক্ষসের চেহারা মনে আসে। এই শরীরে নিরেট বলতে কাঁধের উপরে থেবড়ে বসা সুপুরির মতো মাথাটা। বাদবাকি সব পেট। একমাত্র খিদের অনুভূতি ছাড়া ওই মাথায় কিছু ঢোকে না। অন্যের মন মাথার খবর ও বুঝবে কী করে!

তবে, সবটা না বুঝলেও উপীনের ধরনধারণ যে স্বাভাবিক নয়, এটা বুঝতে পেরেছিল ধেনো। ওই নিরেট মাথা দিয়েই বুঝেছিল, যখন সে ঠাঁই পেয়েছিল উপীনের কাছে।

পাঁচ বছর আগে ধেনোর বেঁচে থাকার কথা ছিল না। যাওয়ার কথা ছিল সটান মাটির তলে। যায়নি সেটা ওর কপাল। হাড় জিরজিরে শরীরখানা ঘোজাডাঙা বর্ডার পেরিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে শুয়ে পড়েছিল ইটিণ্ডা বাজারে। কথা বলার শক্তি নেই, চোখ মেলারও ক্ষমতা ছিল না। আশেপাশে ভিড় করে ছিল ইটিণ্ডার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ। সকলের চোখে মুখে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। ওরা বলাবলি করছিল সীমান্ত পেরিয়ে কী আজব চিজ জুটল! কেউ বলছিল, বি এস এফ ক্যাম্পে খবর দাও, ঠেলে আবার ওপারে পাঠিয়ে দিক। মরতে হয় সেখানে মরুক, এখানে কেন! ধেনো সব শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু সাড়া দেবার মতো গলার জোর, বুকের জোর কিছুই ছিল না। কেউ একজন ওর হাতে পাউরুটি ধরিয়ে দিয়েছিল, কেউ দিয়েছিল জল। সেটুকুও মুখে তোলার মতো শক্তি ছিল না ওর।

হ্যাঁ, সেদিন নিশ্চিত মৃত্যু লেখা ছিল ধেনোর কপালে। কিন্তু সেই অসাড় অবস্থায় টের পেয়েছিল একটা ফাটাচটা হাতের কোমল স্পর্শ। সেই মানুষটা ওকে দু-হাতে তুলে নিয়েছিল, ঠাঁই দিয়েছিল ঘরে, আর সেবা যত্নের কী বাহার! খাইয়ে দাইয়ে

পনেরো দিনেই চাঙ্গা করে তুলেছিল। মরে যাওয়ার বদলে বেঁচে উঠেছিল ধেনো। চোখ মেলে দেখেছিল ওর জীবনদাতাকে। সেদিন থেকেই উপীন হল ধেনোর কাকা। ওর ভাষায়, কা। ইটিশুা বাজারের নগেন ডাক্তার প্রথম ওদের কাকা-ভাইপো বলে ডেকেছিল। পরে ওই ডাক ছড়িয়ে পড়ে ইটিশুা বাজার ছাড়িয়ে, ইছামতী নদী পেরিয়ে সেই কলেজপাড়া পর্যন্ত। আর তখন থেকেই ধেনোর সুপুরি মাথায় কীভাবে ঢুকে যায়, উপীন মানুষটা স্বাভাবিক নয়। কেমন ধারা যেন। কেমন! এর ব্যাখ্যা করার মতো শব্দ বাক্যের সঞ্চয় ওর মাথায় সেদিনও ছিল না, আজও নেই।

উপীন চলে যাওয়াতে যত না দুঃখ পেয়েছে, তার থেকে বেশি হয়েছে রাগ। ওর এমন আচরণের কোনও মানে হয়! এ যেন উঠল বাই কটক যাই ব্যাপার। দেখতে লোকটা সাধু-সন্তের মতন। গেরুয়াটাই যা ধরেনি। তবে হাবেভাবে যেন তেমনই। রোগা লম্বা। পরনে জ্যালজেলে প্যান্ট, ছেঁড়াফাটা জামা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল ঘাড় বেয়ে পিঠের কাছে দোল খায়। এক মুখ দাড়ি বুকের কাছে খাঁচা ছুঁইছুঁই। দেখলেই মনে হবে জন্ম ভিখিরি। কিন্তু কারও কাছে হাত পাতেনি। ধেনো দেখেছে, উপীন লেখাপড়া জানে। ছবি আঁকতে পারে। কাগজ কলম পেল তো ভালো, নইলে চকখড়ি কিংবা ইটের টুকরো দিয়ে রাস্তার উপর বসে পড়ত। কখনও আঁকত দেবদেবী, কখনও নদী-মাঠ-গাছের ছবি। লোকে তাই দেখে বাহবা দিত। কখনও নগেন ডাক্তারের কাছ থেকে খবরের কাগজ চেয়ে পড়ত। ধেনোকে শোনাত দেশ-বিদেশের কথা। ধেনো অবাক হয়ে যেত। কখনও বলে ফেলত, ও কা, সত্যি করে বলোদিনি তুমি কেডা? শুনে উপীন হাসত, দুর শালা, আমি কে তা কি আমি জানি!

এ ধরনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি ধেনো। সুপুরির মতো মাথাটা দোল খেত বিস্ময়ে। উপীন মানুষটা এত কাছের তবু মনে হত কত দূরের। সকাল হল তো ধড়াচুড়ো পরে বেরিয়ে পড়ল। নদী পেরিয়ে শুরু হল ওর হাঁটা। থামা সেই কলেজ পাড়ায়। ফেরাও ওইভাবে। কোনও ক্লান্তি নেই। কখনও বলেনি, কষ্ট হচ্ছে। কখনও বলেনি, চল আজ বাসে যাই। পথ কম নয়। যেতে আসতে প্রায় দশ মাইল। এতটা রাস্তায় ওর চেনা-পরিচিতি মানুষের সংখ্যা এত যে, দাঁড়িয়ে দুটো কথা বললেই বেলা কাবার। কথা মানে কোনও দরকারি বা প্রয়োজন নয়, ওই কেমন আছ বা ভালো আছ গোছের দু-চার বাক্য। আর লোকগুলোও তেমন, হেসে হেসে সব কথার জবাব দিত। উপীন কাউকে ডাকত দাদা, কাউকে দিদি আর বাবামশাই ডাক তো লেগেই আছে ওর মুখে। শুনলে মনে হত কত কালের চেনা। উপীনের গলার স্বর ছিল মিষ্টি, বুলি শেখা ময়না পাখির মতন। ওই ডাকডোকেই কিনা কে জানে, সবাই যেন ওর হাতে যা হোক কিছু গুঁজে দিতে পারলে যেন বাঁচে। যে যা দিত হাত পেতে নিত উপীন। মুখে বলত, একটা মাত্তর পেট, ও চালাতি গেলি বেশি কিছু লাগে নাকি! ধেনোকে বলত, খবরদার লোভ করবি নে, তালি তোরও চলে যাবে।

চলে কেমনভাবে যায় জানত না ধেনো। উপীনের ছত্রছায়ায় থাকত বলে কোনও অভাব মালুম হত না। উপীন না থাকলেই সমস্যা। ওকে একা পেলেই চেনা লোক অচেনা হয়ে যেত। কেউ কেউ আবার মজা করে বলত, অ্যাই ধেনো প্যান্ট খোল।

ধেনোও তেমন, সে-ও পাল্টা বলত, খুললি খাতি দোবা তো?

রাজি হলেই প্যান্ট খুলত ধেনো। অমনি হা হা হি হি হাসির ঝড়, তুই শালা মোচলমান হয়ে হিঁদুর সঙ্গে থাকিস কী করে!

ধেনো বোঝেনি এ কথার অর্থ। ও উপীনকে জিজ্ঞেস করেছিল। উপীনও তেমন। ঠোঁট উল্টে বলেছিল, কে জানে!

উপীনই ধেনোকে খাইয়েছে। খাওয়া মানে যে যা দিত, তাই। ধেনোর তাতে পেট ভরে। উপীন বলত, যা পেইচিস রাজভোগ বলে খেয়ি নে। লোভ করিস নে।

না, লোভ করেনি ধেনো। উপীনের সঙ্গে থাকতে থাকতে উপীন হওয়ারই চেষ্টা করত। আর সেই লোকটা বলা নেই কওয়া নেই, দুম করে হাওয়া! এক বছরের মধ্যে কোনও পাত্তা নেই! কেমনধারা মানুষ কে জানে! এই এক বছরে ধেনো কেমন আছে, কী করছে, কী খাচ্ছে—সে খোঁজও তো নেয়! নগেন ডাক্তার ঠিকই বলে, ওরে উপীন আসলে মানুষ না, মহাপুরুষ। শুধু মানুষ হলে এমনটা কিছুতেই করতে পারত না।

বাতাসে খবর আনার মতো নগেন ডাক্তারই একদিন ধেনোকে ডেকে বলেছিল, খবর শুনেছিস! তোর উপীন আছে হাকিমপুরে। সে ব্যাটা বিয়ে করেছে, মজাসে সংসার করছে, দ্যাখগে যা—।

চমক লাগানো কথা। শুনে ধেনোও চমকেছিল। তারপর হয়েছিল রাগ। উপীন বিয়ে করেছে, সুখে আছে ভালো কথা। ধেনোর তাতে কী! উপীন কি একবার খবর দিয়েছে? একবারও কি ডেকেছে ভাইপোকে? ধেনোর ইচ্ছে হত একবার যায় হাকিমপুর, উপীনকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে আসে। কেমনধারা মানুষ তুমি, নিজের সুখটুকুই ভাবলে! তোমার কথা ভেবে ভেবে ধেনোর যে বুক পোড়ে, চোখে জল আসে—সেটা একবারও দেখলে না!

এই এক বছরে আবার ধুঁকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে ধেনোর। উপীনের মতো সেও দশ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়েছে। উপীনের মতো ডাকডোক দিয়েছে, কিন্তু উপীনের মতো খাতির

দূরে থাক, কেউ দুটো পয়সা দিয়েও সাহায্য করেনি। দূর দূর করেছে। তবে সবাই তো সমান নয়। কিছু লোক মজা করে বলেছে, ধেনো প্যান্ট খোল। ওতেই যা টুকটাক পয়সা কিংবা খাবার পেয়েছে। কিন্তু খিদে সর্বগ্রাসী। উপীন বলত, লোভ করবি নে—। কিন্তু না খেয়ে কি বাঁচা যায়। নাকি হাঁটার ক্ষমতা থাকে! তবে নগেন ডাক্তার দেখেছে, আর দেখেছে ইটিণ্ডা বাজারের লোকজন। কলাটা রুটিটা ছুঁড়ে দিয়েছে কুকুরকে দেওয়ার মতন। আর একজন দেখেছে। সে ওই নাড়ু ঘোষ। ইটিণ্ডা বাজারের শাঁসালো ব্যবসাদার। তবে ওর আসল ব্যাবসা চোরাই চালান। ইটিণ্ডার নিশ্বাস দূরত্বে ঘোজাডাঙ্গা বর্ডার। তার ওপারে বাংলাদেশ। মাল-মানুষ সব রকম আদান-প্রদান কারবারে নাড়ু ঘোষ এক নম্বর। লোকটা দাপুটে। তবে উপীন থাকতে কোনও দিন ওর ঘরের দিকে ঘেঁসেনি। সে চলে যেতে বলা নেই, কওয়া নেই বস্তাবন্দি মাল রাখতে শুরু করে। ধেনো কিছু বলতে গেলে ধমকে বলে, চুপ, তুই এখন আমার লোক। পুলিশ বি এস এফ দেখলে খবর দিবি।

কাজটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে নাড়ু ঘোষ পাঁচ-দশ টাকা গুঁজে দিত ওর হাতে। বলত, তোর মজুরি।

কাজটা ভালো কি মন্দ—এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি ধেনো। তবে নাড়ু ঘোষের লোক হয়ে দেখেছে দিন চলছে, পেটও ভরছে। এই তো যথেষ্ট। ভালো-মন্দ নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

এই নাড়ু ঘোষই খারিজ করে দিল ধেনোকে।

নাড়ু ঘোষ লোকটা ভালো-মন্দে মেশানো। মন মেজাজ এমনিতে ভালো, কিন্তু দোষ হলে মাঝেমধ্যে চালানি মালের সঙ্গে মেয়েমানুষও এনে তুলত ওর ঘরে। ধেনোকে বলত, যা ঘরের বাইরে গে নজর রাখ—।

সেই নজর রাখতে গিয়েই কাল হল ধেনোর। সেদিন রাতেও মেয়েমানুষ এনেছে নাড়ু। মদ-মাংসের ফোয়ারা ছুটছে। নাড়ু ঘোষের মেজাজ শরিফ। খুশি হয়ে ধেনোকেও দু-পাত্তর খাইয়ে দিয়েছে। তারপর ওকে বাইরে পাঠিয়ে নিজে মেতেছে আদিম খেলায়।

বাইরে বসে মশার কামড় খাচ্ছিল ধেনো। চোখে তখনও নেশার ঘোর। মাথায় ঘন ঘন ঝিলিক মারছিল মিঠেল বাতাস। রাতটাও ছিল জম্পেশ। চাঁদ যেন রূপের বান ডেকেছিল। নদীর জলে ছুটেছিল রূপা বর্ণের ফুলঝুরি। এই সময় ধেনোর মন-মাথাও টলমল করে ওঠে। শরীর জুড়ে শিহরণ। অজানা পুলকে লোমগুলো খাড়া খাড়া। না পেরে ধেনো চোখ রাখে ঘরের বেড়ার ফাঁকে। সেটাই চোখে পড়ে যায় মেয়েমানুষটার। সে কী চিৎকার! ঘরে ডাকাত পড়লেও বুঝি এমন চিৎকার করে না।

নাড়ু ঘোষ বেরিয়ে এসে ধেনোর চুলের মুঠি ধরে পাছায় সজোরে লাথি। তারপর গলার টুঁটি টিপে ধরে হিস হিস করে বলে, দু-দিনের মধ্যে ইটিণ্ডা না ছেড়ে যাবি তো ঘাড়ে মুণ্ডু থাকবে না তোর।

ব্যাস, ধেনো খারিজ হয়ে গেল। কী অন্যায় করেছে বুঝল না। নাড়ুর পায়ে ধরেও লাভ হল না। তবে দয়ার বশে ওর হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, তোর এখানে থাকা হবে না বুঝলি, মরতে যদি না চাস, চলে যা—।

অনুরোধ-উপরোধ-কান্নাকাটি—কোনও কিছুতেই হুকুম হাকিম কেউই নড়ল না। ধেনো জানে, নাড়ু ঘোষ যে সে মানুষ নয়। ইটিণ্ডা বাজারে ওর কথাই আইন। ওর এক ইশারায় ধেনোর মুণ্ডু খসে যেতে পারে। নাড়ুর যে কথা সেই কাজ। অতএব ওকে বলা-না-বলা সমান। তবে ধেনো বলেছে। ইটিণ্ডা বাজারে জনে জনে বলেছে। কেঁদেছে। লাভ হয়নি। সবাই চুপ। কেউ সান্ত্বনাও দেয়নি। এমনকী নগেন দাস পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। চাপাচাপি করলে মুখ খিঁচিয়ে বলেছে, এখন আমার কাছে কেন? যখন নাড়ুর পয়সায় ফুটানি মারতিস, তখন মনে ছিল না! ধেনো বুঝে যায়, এখানে কেউ নাড়ুর উপরে কথা বলবে না। এই তালে ধেনোর ঘরটা বেমালুম হাপিস করে নিল নাড়ু।

ধেনো থম মেরে গেল। মনটাও হয়ে গেল বিস্বাদ। এখানকার মানুষ যখন চায় না, তখন কীসের জন্য পড়ে থাকা! মন যখন টেনেছে উপীনের দিকে, তবে ওর কাছেই যাওয়া যাক।

নিজের জিনিসপত্র বলতে খানকতক জ্যালজেলে জামাকাপড়, একখানা ছেঁড়াফাটা কাঁথা, কলাই-এর থালা আর গেলাস। জিনিসগুলোর দিকে একবার তাকাল ধেনো, তারপর ফিক করে হেসে বলল, হেই নাড়ু ঘোষ, ভিখিরির ছা, তোরে এসব দে গেলাম—।

বেহাত হওয়া ঘরের দিকে একবারও না তাকিয়ে পথে নামল ধেনো। ফাল্গুনের ভোর। সূর্য এখনও মুখ দেখায়নি। তার ওঠার আগেই ইটিণ্ডার সীমানা পেরিয়ে যেতে হবে। নাড়ু ঘোষের লোকজন আছে আশেপাশে। দেখলে কি আস্ত রাখবে! পিছন ফিরে একবার থুতু ছুঁড়ে দিল ধেনো। যা শালা, তোদের এখানে আর মুতৃতিও আসপ না।

গাছার পথ ধরে হাঁটছে ধেনো। ভোরের নরম বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। দু-পাশে ফাঁকা ধানমাঠ। ধানের চাষ হচ্ছে শ্যালো পাম্প লাগিয়ে। সবুজ ধানগাছ মাঠময়। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওই সবুজ চিরে কালো রাস্তাটা সাপের মতো চলে গেছে এঁকেবেঁকে। পুবের আকাশ বেয়ে উঁকি দিল সদ্য ঘুমভাঙা

রোদ। রোদের রং কমলা। দেখতে দেখতে ওই রোদ হলুদ হবে। চিড়বিড় করবে গাছপালা, এমনকী গা-মাথা পর্যন্ত।

বাসের শব্দ শুনে দাঁড়াল ধেনো। পকেটে করকর করছে দশ টাকার নোটটা। নাড়ু ঘোষ দিয়েছে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল টাকাটা নাড়ুর মুখে ছুঁড়ে মারে। পরে সামলে নেয়।

ধুলো উড়িয়ে বাস এসে থামল। ধেনোকে দেখে কনডাকটর খিঁচিয়ে বলল, ভাড়া আছে তো?

ধেনো হলুদ দাঁত বার করে বলল, মাগনায় যাব নাকি!

বলে টুক করে উঠে পড়ল বাসে। সকালের বাস ফাঁকা। ধেনো একটা সিটে চেপে বসল। কনডাকটর কড়া চোখে তাকাতেই ধেনো টাকা বার করে বলল, একখান তেঁতুলিয়ার টিকিট দ্যাওদিনি—।

ধেনো যখন হাকিমপুর পৌঁছল, রোদ তখন চড়ে গেছে বেশ। এর মধ্যে বাস বদল করেছে। দাঁড়াতেও হয়েছে অনেক সময়। ভিড়ে হাঁসফাঁস করতে করতে অবশেষে হাকিমপুর পৌঁছনো গেল। এখন উপীনকে পেলে হয়। পেট এদিকে চোঁ চোঁ করছে। ধেনো পেটসর্বস্ব জীব। খিদে সহ্য করতে পারে না।

উপীনের জন্য না হয় এটুকু করা গেল। এখন দেখা হলে বাঁচোয়া। যতই রাগ হোক, ও তো থাকতেই এসেছে উপীনের কাছে। উপীন কি ওকে ফেলতে পারবে?

ধেনো হাঁটতে হাঁটতে বাজারে পৌঁছল। একে ওকে জিজ্ঞেস করল। নাহ্, কেউ সন্ধান দিতে পারল না। উপীন এখানে ভিক্ষে করে না নাকি! তবে চলে কী করে!

ধেনো বাজারের পাশ দিয়ে খালপাড়ে গেল। সরু খাল। বাজারের লোকের কাছে শুনেছে এটা খাল নয়, সোনাই নদী। এই নাকি নদী! নদীতে জল আছে অল্প। ওপারটা বাংলাদেশ। মানে অন্য একটা দেশ। ইচ্ছে হলেও ওখানে যাওয়ার নিয়ম নেই। ধেনো দেখল, এ পারের লোক লোক জল উজিয়ে ও পারে যাচ্ছে, ও পারের লোক এ পারে আসছে। কেউ কিছু বলছে না, বাধাও দিচ্ছে না। বাহ্, এ তো ভারি মজা! মজাটা খানিকক্ষণ উপভোগ করল ধেনো। পেটটা মোচড় দিয়ে উঠছে। খিদেও পেয়েছে। খিদের কথা মনে পড়তেই পেটের ভিতরটা শীতার্ত কুকুরের মতো কুঁই কুঁই করে উঠল। নাহ্, উপীনকে না খুঁজে উপায় নেই।

নদীর পাড় থেকে উঠে এল ধেনো। আবার বাজারের দোকানদারদের জিজ্ঞেস করল। সেইসঙ্গে উপীনের বর্ণনা দিল। এক বছর আগে যেমন দেখেছিল, সেইরকমভাবে বলতে লাগল, এক মাথা লম্বা চুল, বড়ো বড়ো দাড়ি—।

মুদি দোকানি বলল, ও সাধুবাবা তো—!

সাধু! ধেনো অবাক হয়ে গেল।

মুদি দোকানি বলল, এই নদীর পাড় ধরে এগিয়ে যাও, জোড়া তালগাছের তলায় সাধুবাবার ডেরা পাবে।

ধেনো আর কথা বলল না। নেমে পড়ল পথে। মনের মধ্যে ধন্ধ, উপীনকা কি এখানে এসে সাধুর বেশ ধরল!

নদীর পাড় ধরে এগোতে এগোতে ধেনোর নজরে পড়ল উঁচু উঁচু দুটো তালগাছের গোড়ায় একখানা কুঁড়েঘর। সেখানে এক বউ ঘুঁটে দিচ্ছে। আর গজগজ করছে নিজের মনে। কার উপর যেন বুকের ঝাল উগরে দিচ্ছে সরবে। এই কি উপীনের ঘর! ওই কি ওর বউ!

ধেনো ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হলুদ দাঁত বার করে বলল, উপীনকা কি এখানে থাকে নাকি গো?

বউটা চকিতে তাকাল ওর দিকে। চোখে মুখে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা।

ধেনো হেসে জিজ্ঞেস করল, আমি ধেনো, তুমি আমারে চেনবা না।

—খুব চিনি তোমারে। বউটা কর্কশ গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল, তোমারে চেনব না! তোমার কতা শুনে শুনে কান আমার পচে গেছে গো। এসো কুটুম, এসো—।

বউটা দ্রুত পায়ে দাওয়ায় উঠে পিঁড়ি পেতে দিল। ধেনো চুপ মেরে গেছে। বউটা খাতির করছে নাকি বিদ্রুপ করছে, সেটা ওর সুপুরি মাথায় ঢুকল না। তবে ওর রকমসকম সুবিধের মনে হচ্ছে না। কি জানি কী আছে মনে!

ধেনো জিজ্ঞেস করল, কা কনে গেছে গো?

—ওর কি কোনও তালজ্ঞান আছে নাকি! বউটা বলল বেশ চেঁচিয়ে, দ্যাখোগে যাও খালপাড়ে বসে ধ্যান করছে। যেন ধ্যান করলে পেট ভরবে। যত জ্বালা হয়েছে আমার।

ধেনো পিছু ফিরে বলল, যাই কা-রে ডেকে আনি।

—এসো কিন্তু, আবার কাকা-ভাইপো মিলে সটকান দিও না।

—না-না—।

বলে ধেনো পথে নামল। নদীর পাড় ধরে এগলো খানিক। দেখল ঝুঁকে পড়া বটগাছের তলায় বসে আছে উপীন। নির্বিকার ধ্যানস্থ মূর্তি। চিনতে অসুবিধে হল না। এক বছরে বিশেষ কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ল না। সেই একরকম চেহারা। চুলগুলো আরও বড়ো হয়েছে। সাদাটে ছোপ পড়েছে এই যা।

উপীনকে দেখে ধেনো আর রাগ করতে পারল না। কতরকম ভেবেছিল, উপীনকে কড়া কথা শোনাবে। সেসব আর মনেই পড়ল না। পুরনো দিনের মতো আদরকাড়া গলায় ডেকে বলল, ও কা—।

উপীন চোখ না খুলেই বলল, এইচিস! আয়, ভালো করলি এসে।

এমনভাবে বলল যেন ধেনো আসার খবর ও জানত। অবশ্য উপীনের রকমসকমই এই। ধেনো অবাক হল না। হেসে বলল, তুমি ভালো আছ কা?

—ভালো কি আর সহজে থাকা যায় রে! একটা খাঁচায় পড়ে আছি। তুই এসে বাঁচালি আমায়। চল যাই—।

উপীন হঠাৎ উঠে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল। ধেনো চিৎকার বলল, ওদিকে কনে চললে ও কা, তোমার ঘর তো—!

—ঘরে আর যাব না রে। উপীন বলল হাসতে হাসতে, চল তোতে আমাতে বেরিয়ে পড়ি—।

—কিন্তু তোমার বউ!

—যার ভাবনা সেই ভাবুক গে। তুই চলদিনি—!

উপীন সত্যি সত্যি হাঁটছে দেখে ধেনো ছুটে এসে ওর হাত ধরে বলল, ও মা তোমার বউ যে আমারে খাতি বলল! না খেয়ি যাব নাকি! কেমন লোক তুমি, চলো চলো—!

উপীনকে প্রায় টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এল ধেনো। উপীন দাওয়ায় বসতেই ওর বউ ছুটে এল হাতপাখা নিয়ে। হাসতে হাসতে বলল, সাধুবাবার এতক্ষণে মনে পড়ল আমার কথা!

ধেনো বলল, আমি তবে ডুব দে আসি।

বউটা বলল, তাড়াতাড়ি এসো, ভাত বাড়ছি—।

ধেনো খানিকদূর গিয়ে ফিরে দেখল, বউটা উপীনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। উপীন চোখ বুজে সেই আদর উপভোগ করছে। ধেনো ফিক করে হেসে ফেলল। উপীনকে এবার সে পালাতে দেবে না, নিজেই উপীন হয়ে যাবে।

ধেনো দ্রুত বাসরাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল।

কালোভূত

সমীরণ কুণ্ডু

যে মোবাইল ফোনটি দীর্ঘ দশ বছর পরও রয়ে গেলো—অন্তত প্রত্যহ লেখার সময় ভীষণ অনুগত—ধারালো না হয়েও আমার বিচরণ সঙ্গী—আন্তর্জাতিক, দেশীয় অথবা জেলা স্তরের যাই হোক না ক্যানো—বিশেষ করে এমন অলৌকিক যা স্পর্শদানে আসক্তির—সেই স্পর্শকাতরতা এখন অবশ্যি নেই—তাকে ছুঁড়ে ফেলেছি বার কয়েক রাগ করে; আহত হবার পরও সাড়া দিয়ে গ্যাছে—

এখন পেপার ওয়েট

দ্যাখো লেখার সময় উদ্ভট ও অমূলক ভাবনার বশবর্তী আমি—বিলাসী নয় তবু গভীর ক্ষতটুকুতে শুশ্রূষা ভালবাসি। আমার বাল্যকাল দ্যাখে নি সে; যা শুনেছে এবং এখন যা তুল্যমূল্য; তেমন কিছু নয়—অনুমান নির্ভর কতগুলো বিচিত্র কণা, বিবর্তনের সাথে পৃথিবীর অনুষঙ্গে ওরই দিকে হাঁটছে।

খরিদ করার সময় পছন্দ তত্ত্বের সীমানা কতবার লঙ্ঘন করেছিলাম। সেই থেকে স্থান পরিবর্তনের বিধিসম্মত সতর্কীকরণ মেনে নিয়ে জড় নির্ভরতা ক্রমশ চেপে বসেছে।

সম্পর্কিত পেপারওয়েটটি আমি নিজে বয়ে বেড়াই। ওর সাংকেতিক মূল্যের অনুপাত ও সখ্য মেপে দেখেনি। দৃশ্যান্তরে হারিয়ে যাবার পর তাকে নিয়ে ভাববার মতো মানুষ কী থাকবে?

মূল্য ব্যবস্থাপনা ঠিক কোন দিকে যাবে অদূর ভবিষ্যতে; কে জানাবে? অথচ পেপারওয়েট জানে আমার সমস্ত অতীত। নাগরিক বার্তা-বিনিময়। মনঃসংযোগের কাছে লিখে যাওয়া উত্তর ইতিহাস কথা—ওর ভূমিকা ও সন্তরণ; হঠাৎ করে বিষয় বদলের কারণ; বাতাসের নিরাকার ভঙ্গিমা নিয়ে মধ্যবর্তী চলাচল; নির্বাচিত অলঙ্কার সমূহ।

বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের মাঝে কাল্পনিক আকারগুলি তবে কী? একবার ভ্রমণের সময় কবি অরুণ কুমার দত্ত এবং বিভাবসু একসঙ্গে বলেছিল—'হাঁসেরাও ট্রাফিক পুলিশ'।

মোবাইলের রঙ প্রথম অবস্থায় ছিল কালো—এখন বর্ণবিভ্রাট কিছু তো হয়েইছে—অক্ষর সঞ্চালনের সময় ওর কাজ হ'ল ধৈর্যের আপেক্ষিক চরিত্র নিয়ে নিযুক্তিকরণ—লিখতে বসে সাক্ষী রেখে বিচ্যুত হয়েছি অনেক। প্রতিবার সংরক্ষণের জোরালো নির্ভরতা বজায় রেখেছে। অথচ শুরুর দিকে তত বিশ্বস্ত ছিল না। আমার অবান্তর পৃথিবী হয়তো চীৎকার করেছে সে সময়; আমিই যোগাযোগ রাখতে পারিনি।

এটি নোকিয়ার একটি হারকিউলিস মডেল। গুপ্ত কারণে নাম বলা বারণ। এর আগে তিনবার মোবাইল ফোন হারিয়েছি। একবার গৌহাটী থেকে ফেরার সময় নিউকোচবিহার স্টেশনের আগে ট্রেনের কামরায়। ঘুমন্ত চোখে হিসু করতে টয়লেটে ঢুকেছি। সে সময় শীতকাল—প্রচণ্ড গতিতে ট্রেন ছুটছিল। সাথেই ছিল, পকেট থেকে পড়ে নিমিষে ট্রেনের তলায় চলে গেল। একবার বর্ধমানে টানা রিক্সায়—নামার অনেকক্ষণ পর দেখি নেই। অথচ রিক্সা চলাকালীন কথা বলেছিলাম। আরেকবার বর্ধমান রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেকে নেমে বুঝতে পারি মোবাইল ফোনটি পিকপকেট হয়েছে। চীৎকার করেও লাভ হয়নি। ট্রেনে খুব ভিড় ছিল সেদিন। গঙ্গাসাগর সেরে পুণ্যার্থীরা ফিরছিলেন।

যেটি বলার; ওগুলো সবকটির আমার পেপারওয়েট হবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য লাগে তো একটিই; —এই কালো ভূতটি আমাকে ছেড়ে যেতে পারল না।

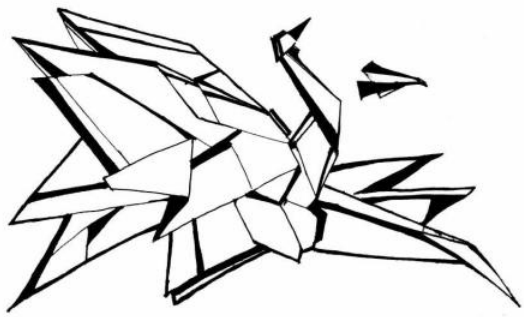

ও'দুটোর জন্য

পার্থ মুখোপাধ্যায়

হ্যাঁ গো গিন্নি আমাদের জ্যাক্, রকির গলা পাওয়া যাচ্ছে না? বাড়িতে চোর এল নাকি!

গিন্নি হাই তুলে ক্লান্তি ভরা গলায় উত্তর দেয়,—হতে পারে। রাত্রি বেলা তো চোর আসারি সময়।

অবিনেশ চট্ করে হাত ঘড়িটাই চোখ বুলিয়ে নেয়। বারোটা-পঁচিশ। ভালোই রাত হয়েছে। একটু দ্রুত পা চালাই।

রাত হবে না কেন। ছোট বেলার বন্ধু মিলন। কত সুখ-দুঃখের সাথি। তারি একমাত্র পুত্র অরিশের বিয়ে বলে কথা। তিন দিন ধরে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। সেখানে বৌ-ভাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে আসা যায়।

মিতা তো দশটা বাজতে না বাজতেই তাড়া লাগাচ্ছিল, —চল এবার খেয়ে নেওয়া যাক। জ্যাক, রকি কে কতক্ষণ না খাইয়ে রাখবে। আসলে জ্যাক্, রকির না খাওয়ার চিন্তা থেকে, মিতার নিজের বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল।

এইসব সেন্টিমেন্ট্ মিতা বুঝবে না। তাই আর একটু পরে পরে করে, খেতে বসার সময় বাড়িয়ে নিয়েছিল অবিনেশ। তার জন্য অবশ্য কড়া চোখের চাউনি ও বামদিকে তিনবার কনুই-এর গুঁতো খেতে হয়েছে।

গুঁতো খাওয়ার পরেও অবিনেশ শুধু সাইডটা চেঞ্জ করে নিয়েছিল, মুখে কিছু বলেনি। বাড়ির সকলের সাথে শেষ ব্যাচে খেতে বসে। নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে।

পাশের পাড়া থেকে এইটুকু পথ তারা হেঁটেই আসছে। মিলন বারবার বলছিল গাড়ি পৌঁছে দেবে। সারাদিন খাটা-খাটনি করা ড্রাইভারের শুকনো মুখ দেখে অবিনেশ গিন্নির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, গাড়ির দরকার নেই মিলন। খাওয়ার পর একটু হাঁটাও তো ভাল। সামান্য পথ হেঁটেই চলে যাব।

রাস্তার বাঁকটা ঘুরতেই বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার আনন্দ অবিনেশের হারিয়ে যায়। দেখে কি, বাড়ির সামনে পাশের বাড়ির দিলীপ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঘোরা ঘুরি করছে।

জ্যাক্ ও রকির জন্য আনা খাবারের প্যাকেটটা মিতার হাতে ধরিয়ে, অবিনেশ এগিয়ে যায়। ব্যাপারটা কি দেখতে হয়। কিছু বিপদ হলো নাকি?

কাছে যেতেই একেবারে সাড়ে তিন-ফুট থেকে পাঁচ-ফুট পর্যন্ত দিলীপের টীম অবিনেশকে ঘিরে ধরে।

অবিনেশ, —কী ব্যাপার দিলীপ রাত্রি বেলা এখানে, কিছু ঘটেছে নাকি?

কোনো উত্তর নেই। কিন্তু দিলীপের ঠোঁটের কম্পন রাস্তার আলোতে বেশ দেখা যাচ্ছে। তোতলা তো। উত্তেজিত হয়ে পড়লে তোতলামি বেড়ে ....।

দিলীপ, —এই যে অ-অবিনেশ দু-দু-দুটো কু-কু-কুকুর নিয়ে মা-মা-মাতব্বরি হচ্ছে। চি-চি-চিল্লামেল্লির চোটে পা-পা-পাড়াই থাকা দা-দা-দায় হয়ে গেছে।

অবিনেশের মাথাটা চাঁ করে গরম হয়ে গেল। মাতব্বর কথাটি শুনে। 'কি আমি মাতব্বর, তুই খুব ভদ্র না। নির্লজ্জের মতন মাঝ রাতে আমার বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছিস। আর শোন, দুটো কুকুর পুষি কি পাঁচটা তাতে তোর কি?

দিলীপের ঠোঁট কম্পন বেড়ে গেছে, —তো-তোর কু-কু-কুকুরের চি-চি-চিল্লা মে-মে-মেল্লিতে কি আ-আমার বা-বাড়ির সামনে ঘো-ঘোরাঘুরি করব? মেয়ে জা-জামাই এসেছে। ছো-ছো-ছোট্ট নাতিটি ঘু-ঘুমাতে পা-পারছে না। ভ-ভয়েতে খালি কাঁ-কাঁ-কাঁদছে। চি-চি-চিল্লাচ্ছে।

ও তোর নাতি চিল্লাচ্ছে কানের গোরায় তা অসুবিধা হচ্ছে না। অবলা পশু দুটি যেই একটু, এই যে তোরা দলবল নিয়ে আমার বাড়ির সামনে দাড়িয়ে জ্যাক্ ও রকি-কে উত্তেজিত করছিস। কুকুরগুলো তোদের জন্য চিত্কার করছে। তাদের গলা চিরে যাচ্ছে না।

অ-অবিনেশ তুই হা-হাসালি। কু-কুকুরের আবার গলা চেরা! শো-শোন কু-কুকুর গু-গুলোকে থামা। পারলে কা-কালকেই বিদায় কর।

ও'আমার দিলীপ বাবু এসেছে উনার জন্য দুটো এ্যাল্‌শিশিয়ান কুকুর বিদায় করতে হবে। শোন পারলে তুইও তোদের লিলিপুট গুলোকে কানে তুলো গুঁজে থাকতে বল।

দিলীপের ঠোঁটের অবস্থা যথাযথ খারাপ। লড়াই তার দ্বি-গুণ বেড়ে গেছে।

দিলীপের ছেলে আঙ্ক চুপচাপ শুনছিল। এবার বলে উঠলো, —অবিনেশ কাকু কিছু বলছি না বলে দুর্বল ভেবে বসবেন না। নেহাতি অয়ন আমার বন্ধু বলে এতক্ষণ চুপ ছিলাম। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে।

দিলীপের জামাই জীবন নিরীহ টাইপের। সে দর্শকের স্থান গ্রহণ করেছে। মেয়ে রূপা ছেলে সামলাতে ব্যস্ত। ছেলেটির বয়স এক বছরের কিছু বেশি হবে। নাম রেখেছে বিশ্বজিৎ। সারাক্ষণ চিল-চিতকার করে। কারুর কোলে দু দণ্ড সুস্থভাবে থাকতে জানে না। কোলে নেওয়া খুবই বিপদজনক। কোল থেকে খালি লাফিয়ে পড়ে।

অবিনেশ একবার নিয়েছিল আজ থেকে দুই-তিনমাস আগে। কোলে নিয়ে আদর করতে করতে দিলীপের বাড়িতে একটি ইদারা আছে; তাতে মাছ ছাড়া আছে, তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে বাচ্চাটি কোল থেকে লাফ মারতে গিয়েছিল, অবিনেশ ঠিক সময়ে জাপটে ধরে না নিলে কি হত। আজও ভাবলে তার লোম খাড়া হয়ে যায়।

এমনিতে দিলীপের ফ্যামিলি গ্যাঁড়া বলে আড়ালে পাড়ার কম-বয়সি ছেলেদের মাঝে হাসি মসকরা চলে। সেটা দিলীপের অজানা নয়। তার উপর, মুখের সামনে অবিনেশ লিলিপুট বলে ফেলেছে। এখন ফুটন্ত তেলে জলের ছিটের মতন অবস্থা।

দিলীপের এতক্ষণে কথা বার হল, —তা-তারমানে তুই ব্যা-ব্যাবস্থা নি-নিবিনা। আচ্ছা আ-আমিও দে-দেখে নেব। লি-লিলিপুট বলা।

তুই কী করবি কী?

আ-আমিও তোর ম-মতন কু-কুকুর পুষব ত-তবে দু-দুটোর জা-জায়গায় পাঁ-পাঁচটা।

দিলীপ তুই পাঁচটা কুকুর কেন? দশটা গরু, ভেড়া পুষগে যা। আমার দেখার দরকার নেই।

মিতার যেন এতক্ষণ বাদে হুঁশ ফিরল। দুজনে মিলে রাত দুপুরে করছে কি! বলে উঠল, —তোমরা থামবে, কী শুরু করেছ?

এই কলহ দূষণে অন্যান্য বাড়িগুলিতে আলোময় হয়ে উঠেছে। তারা বাড়ির বাইরে—এসে রাতের নাট্যের দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে।

অন্য দিক থেকে অবিনেশের কপাল ভাল। তার বাড়ির অপর পাশের জায়গাটি বাউন্ডারি ঘেরা আম, জাম, নারকেল গাছের বাগান। তার বদলে বাড়ি থাকলে, তারাও এই কলহে দিলীপের সমর্থনে অবতীর্ণ হত।

ঠিকিই তো বলেছে মিতা। তা তোমার অবিনেশ কে থামাও না। দিলীপের স্ত্রী মাধুরি বলে উঠল।

মিতা, — আ মাধুরি তুমি একটু থামনা।

দিলীপ, —ঠি-ঠিক তো বলেছে। অবিনেশ যদি কু-কুকুর গুলো ....।

মিতা জোর করে অবিনেশকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে সদর দরজা এঁটে দিল। না হলে প্রায় হাতা হাতি ....।

তোমার কী হয়েছে বলতো? ঝগড়া বাড়িয়ে চলছিলে। তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব আর টিকবে?

অবিনেশ, —বকে মাথা খারাপ করো না মিতা। বন্ধুর নিকুচি করেছে। পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে চিত্‌কার না করে, এই কথাগুলো বাড়িতে এসেও বলতে পারত। শালা! বিয়ে বাড়ির শেষ মেনুর আইসক্রীমের জিভে লেগে স্বাদটি পর্যন্ত তেতো করে দিয়েছে।

পরের দিন প্রাতঃভ্রমণে অবিনেশ একাই বার হলো। আজ কুকুর দুটোকে আনতে মন চাইয়ে নি। রাতের তিক্ততা মনে ভার হয়ে বসে আছে। কলহ জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমসানি গরমকে হার মানিয়েছিল। সারা রাত এপাশ-ওপাশ করা ছাড়া অবিনেশ দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

এমনিতে ওরা এলে রাস্তায় খুব একটা মানুষ জন পাওয়া যায় না কথা বলার জন্য। আর মোড়ের মোড়ের কুকুরগুলো ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে এমন দৌঁড়ায়। যেন ইঁদুর দুর থেকে বিড়াল দেখেছে। অন্য সময় দিনের বেলা অবিনেশ এই রাস্তা দিয়ে গেলে কুকুরগুলো এমন করুন চোখে তাকায় মনে হয় বলতে চাইছে, দশ বিশ ঘা দাও কিন্তু, সারারাত জাগার পর সকালবেলা রেসের ঘোড়ার মতন দৌড় করিও না।

মিতা তো কোন কালে বেরোয় না। বলে, তোমার ও কুকুরের ভুঁড়ি হয়েছে, তোমার যা খুশি করো গে যাও। আমার ঘুমের ডিস্‌স্ট্যাব করো না।

মধু যে, তোমার তো পাত্তাই পাই না। প্রায় এক বছর হল বাড়িতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ?

মধু, —অবিনেশ তোমার কুকুর দুটো যা। ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে, এই রাস্তায় আসার সাহস হয় না। কিছুক্ষণ আগে একজন জিজ্ঞেস করছিল, —তোমাদের দেখতে পেয়েছি কিনা।

হা-হা, তাহলে সবাই ভয় পায় কি বলো মধু। জ্যাক্ ও রকির যা বাঘের মতন চেহারা হয়েছে। দেখে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তোমার বাপ-ঠাকুরদার কুকুরের গল্প শুনেই তো আমার আগ্রহ জমানো, তাহলে এবার হার মানলে তো?

আরে আমার বাপ-ঠাকুরদাদের কুকুর দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মোটে তোমার দুটো ...।

ব্যাটা মঁচকায় তবু ভাঙে না। দশ বছরের পরিচিতিতে বাহান্ন বছর বয়েসেও যাইনি। দেখা হয়, শুধু গুল শোনায়। নেহাতি মনে মনে জব্দ করার ইচ্ছা ছিল তাই ...।

মধুর সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অনেক হাঁটা হয়েছে এবার বাড়ি ফেরা যাক। ডানদিকের রাস্তাটায় যেই অবিনেশ ঢুকেছে, পেছন থেকে ডাক, —ও' অবিনেশ-দা, অবিনেশ-দা।

কেরে বাবা! ষষ্ঠি দাঁত বার করতে করতে এল।

ষষ্ঠি, —অবিনেশ-দা এই রবিবার বিকাল পাঁচটায় ক্লাব মাঠে মিটিং ডাকা হয়েছে। তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। তা না হলে মিটিং অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কেন? আমাকে তোমাদের মিটিং-এ কী এমন দরকার পড়ল যে, অবশ্যই কথা জুড়ে দিলে!

ষষ্ঠি দাঁত বার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই অবিনেশ, —সামনে গঙ্গা পূজা, নূতন করে তার আবার পরিকল্পনা নেই তো। কালিপূজাতে গত বছর চাঁদা বাবদ দুই হাজার টাকা গছিয়ে নিয়েছিলে। মনে পড়লে এখনো বুকটা চিন্ চিন্ করে ওঠে।

ষষ্ঠি দন্ত বিকশিত রেখে, তুমি শুধু শুধু রেগে যাচ্ছ। গঙ্গা পূজার কোন প্লান নেই। এবার অন্য ব্যাপার, তোমাকে খুব দরকার।

অন্য ব্যাপার! তা কি ব্যাপার, একটু খুলে বল না রে? আমার থেকে মোটা টাকা গছিয়ে নেবার জন্য আবার ক্লাব প্রেসিডেন্ট করার মতলব নেই তো?

ষষ্ঠি গম্ভীর হয়ে, —দাদা তুমি গেলেই সবকিছু জানতে পারবে। এই বলে ষষ্ঠি চলে গেল। তার তাড়া আছে। সবাইকে মিটিং-এর খবর দেওয়ার শুরুদায়িত্ব তার ঘাড়ে। ডিস্ট্রিবিউটর-এর ঘরে কাজ করে বেলায়। সময় হবে না। তাই সাত সকালে মিটিং-এর খবর ডিসট্রিবিউট্ করতে শুরু করে দিয়েছে।

হ্যাঁ গো তুমি স্নান করতে ঢুকলে। তোমার সখের কুকুরের পায়খানা কে পরিষ্কার করবে। একে আমি ঘৃণায় মরি।

আ-হা তুমি আজকে একটু পরিষ্কার করে দিও না। দেখছ অফিসের তাড়া ভুলে গেছি।

আমি পারব না। তুমি কুকুর পুষেছ তুমি করো।

আমিও তো তোমাকে এত বছর ধরে পুষছি। —অবিনেশের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

ঘি যা পড়ার পড়ে গেছে। এখন কলহ—অগ্নি শিখা অনেকদূর উঠবে।

কি এত বড় কথা। আমাকে বলতে পারলে, আচ্ছা আজকেই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। বুঝবে মজা।

কিচ্ছু বুঝব না। মেয়েরা একটি ব্যাপারে সবাই সমান পারদর্শী। আমাকে ভয়-টয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। তারপর এই বয়েসে রাগ করে বাপের বাড়ি গেলে, থুঁড় থুঁড় বাপ আর পুষবে না।

আচ্ছা আমার বাবা থুঁড় থুঁড়ে আর তোমার বাবা আশি পঁচাশি বয়স পর্যন্ত তাগড়া জোয়ান ছিল।

বকো না তো, কথা বলতে গিয়ে মুখে শ্যাম্পুর ফেনা চলে গেছে। এ্যাঁ কি বিচ্ছিরি, দূর দূর।

অফিস ফিরতি অবিনেশ পুরোপুরি সারাদিনের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তার উপর রান্না চাপানোর ঝঞ্ঝাট। এক ঘন্টা ধরে স্টোভের পেছনে লেগে আছে। ওয়াশার সারাতে সারাতে হাতে মুখে কালি-কুলি মেখ যা তা অবস্থা। রান্না তাকে কোন কালেই করতে হয়নি।

এই অবস্থায় পড়তে হবে জানলে পঁচিশ বছর আগে বিয়ের পিঁড়িতে কি বসতো। যাদের জোরাজুরিতে যে অঘটনটা সেই দিন ঘটেছিল, তারা আজ স্বর্গবাসি। রাগ মিটাবে তার উপায়ও নেই।

সকালে বাথরুমে শাওয়ারের তলায় দশ মিনিট থাকার পর অবিনেশের মাথা ঠান্ডা হলো। বুঝতে পারে, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। বাথরুম থেকে বাইরে এসে মিতার রাগত মুখটা দেখে বলে, আমি হরিজন বলে দিচ্ছি, এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। তাতেও চিড়ে না ভিজলে, খেতে খেতে আর একবার চেষ্টা করে অবিনেশ, —বলছি সাতটা দশটা সিনেমা দেখতে যাবে। জয়মাতে একটা ভাল হিন্দি ফ্লিম চলছে। মিতার থেকে উত্তরের বদলে অফিস থেকে ফিরে গেটে তালা পেয়েছে। আর 'টী টেব্‌লে কাগজের উপরে লেখা, —"আমি বাপের বাড়ি চল্‌লাম।"

কাগজটি পড়ার পর অবিনেশের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, 'শালা জিদে জিদে দুনিয়া শেষ হয়ে গেল। একবারও তার কথা ভাবল না।' দ্বিতীয় চাবিটি অবিনেশের কাছে থাকে বলে এত বড় সুযোগটি নিতে পেরেছে।

যাইহোক হোটেলের খাবার সহ্য হয় না বলে রাঁধতে বসতে হবে। আবার কুকুর দুটিও আছে। অবলাদের কথাও মিতা চিন্তা করেনি।

মুগডালটা সবে সেদ্ধ বসিয়েছে। গ্যাস শেষ। অবিনেশের মাথায় হাত। ভগবান কী পরীক্ষা নিচ্ছ? যাবার আগে এটাও লিখে যা, গ্যাস শেষ স্টেজে। এই হাঙ্গামার মধ্যে পড়বে জানলে, বন্ধু পীরিত দেখিয়ে তিনদিন আগে একটি ভর্তি সিলিন্ডার তাদের গ্যাস ফুরিয়েছে বলে দিতাম না।

এক রাশ বিরক্তি নিয়ে অবিনেশ বন্ধু কে ফোন করে, —হ্যালো। —অভি, কে? —ও' হো মঞ্জুসা। —না না, অভিকে দরকার নেই। —মঞ্জুসা তোমার গ্যাস ডেলিভারী দিয়ে গেছে? আমি খুব বিপদে পরেছি। —এখনো তিন-চার দিন! —ও' খুব বিপদে পরলাম। শোনো না মঞ্জুসা, তুমি ম্যানেজ করে সিলিন্ডারটা ফেরত দিতে পারবে। —যা! বাপের বাড়ির লোকজন আসছে। এখন কী হবে? —স্টোভ্!

আধঘন্টা বাদে অভির ছেলে রবি স্টোভ্‌টি দিয়ে গেল। সেই থেকে অবিনেশ এর পেছনে। শালা স্টোভ জ্বালাতে দিয়েছে না সারাতে দিয়েছে! ট্যাঙ্কে যত না তেল ধরে তার থেকে বেশি ঘাম শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। আগে জানলে রবিকে দিয়ে স্টোভ্ জ্বালিয়ে নিতো।

কান-মাথা খারাপ করা আওয়াজ নিয়ে সবে স্টোভ্‌টি জ্বলতে শুরু করেছে। ল্যান্ড ফোনটি বেজে উঠলো—ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং—ডালের কড়াইটি স্টোভের উপর বসিয়ে বিরক্তি নিয়ে হ্যালো অবিনেশ বলছি। —ও' অয়ন— তা বাবু কবে আসা হচ্ছে। —কালকে? বা বা —শরীর ভাল তো কাজ কি রকম চলছে? —বা বা। তা বাবা এই বাপের কথা মনে থাকে না? একবারও তো ফোন করো না। —হ্যাঁ, ও' হ্যাঁ—মা। ইয়ে, মামার বাড়ি গেছে। —কালকে, ঠিক আছে। —রাখছি তাহলে বাবু।

অবিনেশের মুখে হাসি দেখা দিল। যাক ছেলে কাল আসছে। চিন্তা একটু কমলো। রান্নাটা অয়ন ভালো করে। 'ও' তোরা বাপু থামতো। তোদের জন্যেই যত অশান্তি।

আজ রবিবার আবার মিটিং আছে। যেভাবে ষষ্ঠি বলেছিল, মনে হয় সভাপতি টভাপতি করে ছাড়বে। যদি একবার সভাপতি হতে পারি দিলীপ কে জব্দ ....।

বাবু চাল নিয়ে বিকাল বেলা অবিনেশ বাড়ি থেকে বার হলো। অয়ন এখনো আসেনি। মা-বেটা মিলে সব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সকালে আসার কথা। হঠাৎ ফোন—মামার বাড়ি হয়ে বিকালে আসছি। শনিবার অফিসটাও কামাই হয়ে গেল। আর কত দিন চলবে সেটাই অবিনেশকে ভাবাচ্ছে।

'এই যে পটল, তোমাদের মিটিং শুরু হয়েছে?'

পটল, আজ্ঞে না। সবাই এসে গেছে, আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। পটল দোকানে চা আনতে গিয়েছিল, তাই নিয়ে ফিরছে।

'তুমি বলতে পারবে আমাকে ডাকা হল কেন?'

সেটা আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন।

'তা সভাপতি .....।'

এই যে আসুন আসুন অবিনেশ কাকা, এখানটাই বসুন। —মিন্টু বলল।

চারদিকে অবিনেশ একবার ভালো করে দেখে নিল। বসুন্ধরা ক্লাব প্রাঙ্গণে মোটামুটি সমাজের ছোট, মেজো, বড় সব দাদারা তার সাথে দিলীপও উপস্থিত।

মিন্টু। —কাকা চা খাবেন?

না মিন্টু। তা কী জন্যে ডেকেছ। সেটা বলাই ভাল।

মিন্টু, —ও' স্বপনদা তুমি শুরু করো।

মিন্টু ওই ক্লাবের সেক্রেটারি। আবার রুলিং পার্টির সদস্য। তবুও তাকে নিয়ে ওতো চিন্তার কিছু নেই। খুবই ভদ্র ছেলে। পার্টিতে ভবিষ্যত উজ্জ্বল। কিন্তু, স্বপনকে দেখলে ভয় করে। পাকা মস্তান। সামনের পৌরসভার ভোটে নাকি চেয়ারম্যান-এর দৌড়ে ছিল। নিজের ভুলে চাকরির টোপে টাকা নিতে গিয়ে, হাতে নাতে ধরা পড়াতে পার্টির মুখ পুড়িয়ে প্রার্থী লিষ্টের বাইরে চলে গেছে। তবে এটাই ভরসা মস্তান হলেও ছুরি-পিস্তল হীন।

কোনো ভনিতা না করে স্বপন, —অবিনেশ দা তুমি দু-দুটো কুকুর পুষেছ। সকাল করে নিয়ে বেড়াও। তাতে ভয়ে অন্য মানুষ জন বেরোতে পারছে না। খবরের কাগজ দেয় যে ছেলেটা বলে দিয়েছে, কাগজ পেতে দেরি হবে। জীবন হাতে নিয়ে পেপার দিতে পারব না। তোমার কুকুর রাস্তার কুকুর দেখলে এমন ডাকছে। গরমকালেও সকালে ঘুমের ডিস্‌স্টাব হবে বলে রাস্তার দিকের জানলা রাতে বন্ধ করে শুতে হচ্ছে। কিছুদিন আগে ধীরেনদের বাড়ির সামনে কুকুরের পায়খানা পাওয়া গেছে। দেখে যা মনে হয়েছে বিদেশী কুকুরের। কী বলেন ধীরেন?

অবিনেশ, —এই জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছে! তা ময়লাটাতো আমার কুকুরের নয়।

সে আপনার হোক বা না হোক, আপনি শুধু কুকুর দুটির ব্যবস্থা নিন। —পেছন থেকে এক উঠতি বয়সি ক্লাব রত্ন বলে উঠলো।

অবিনেশ, —জোর প্রতিবাদ করে। কুকুর দুটি আমার। রাস্তায় যদি একটু বার করি কার কি বলার আছে। কেউ তো বলতে পারবে না। তাকে কামড়েছে?

আড়চোখে অবিনেশ একবার তার ডানদিকে বসা দিলীপের দিকে তাকালো। নাটের গুরুর ঠোঁট কাঁপছে কিছু বলবে

বলে। তার আগেই ধীরেন বলে উঠল, —তার গ্যারান্টি কী আপনি দেবেন? কাল যদি কিছু হয়ে যায় তার ভোগান্তি কে নেবে?

অবিনেশ, —দুঃখিত। আমি যে তোমাদের কোন কথা মানতে পারছি না। এবার কী বাড়ি যেতে পারি?

এই পটলা খাতাটা অবিনেশকে দেখা। —মধু বলল।

একি মধু তুমি যোগ দিয়েছ এদের দলে। আমি তোমাকে এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি!

মধু, —অবিনেশ তোমার কুকুর দুটি সত্যিই ভয়াবহ। তারপর কথাগুলো প্রত্যেকটাই সত্যি। তাই মিটিং-এ আসার অনুরোধ না রেখে পারলাম না।

অবিনেশ, —কিন্তু, একদিন তুমি তো আমাকে তোমার বাপ ঠাকুরদার কুকুর পোষার গল্প বলে খুব উৎসাহিত করেছিলে। এমনকি গালিব স্ট্রীটে নিয়ে গিয়েছিলে কুকুর বাচ্চা কেনার জন্য।

মধু, —হেঁ হেঁ। আমার বাপ ঠাকুরদার কুকুরগুলি খুব শান্ত ছিল। অবিনেশ তোমার ওই দুটি যে বাগ বাচ্চা হয়ে উঠবে, তা আমি কি করে জানব।

ততক্ষণে অবিনেশের হাতে একটি খাতা চলে এসেছে। চার-পাঁচটি লাইন লেখা। তার নিচে পাড়ার হেঁদো থেকে কেঁদো সই করে বুঝিয়ে দিয়েছে সবাই আমার বিরুদ্ধে।

কী বু-বু বুঝলে তো অ-অবিনেশ। ছেলে পু-পুলের প-পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। কু-কুকুর দুটো শ-শব্দ দূ-দূষণ করছে। —দিলীপ সুযোগটা নিয়েই নিলো।

অবিনেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই স্বপন বলে উঠলো। অবিনেশদা আমরা গুপ্ত মিটিং-এ ঠিক করেছি, আপনি কথা না শুনলে সবাই রাস্তায় ঢিল নিয়ে বেরব। যেখানে কুকুর দুটোকে দেখব, ইট বৃষ্টি চলবে। বাড়িতেও ইট মারব। পারলে থানা-পুলিশ ....।

অবিনেশ চুপ-চাপ হয়ে আছে। হাত-পা তার মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কী করে যে বাড়ি ফিরেছে, শরীর টলমল করার জন্য দুইবার টাল খেয়ে পড়ে যাওয়া থেকে সামলে নিয়েছে।

রাত্রি এখন দশটা, অয়ন আসবে বলে মনে হয় না। ভৌঁ ভৌঁ ভৌঁ ভৌঁ — দূর কুকুর গুলো চুপ করতে যানে না। ভুল যখন হয়েছে, পাপক্ষয় তাকেই করতে হবে। সন্ধ্যে থেকে অবিনেশ এই কথাটি বার বার ভেবে ভেবে মন স্থির করে। আরে এতদিনকার ইনিংসে একটু আধটু ভুল হতেই পারে। তা বলে জিদ ধরে থাকার কোন মানে হয় না। ও'পাশে থাকলে ...।

অনেক চেষ্টার পর। অবিনেশ বলছি—কে জামাইবাবু, কেমন আছেন? ভাল আছি শীলা, তুমি কবে এলে? —আজ বিকালে জামাইবাবু। —তা বাবা ও মা কেমন আছেন? —ভাল, সবাই ভাল এখানে জামাইবাবু। দিদিকে ডেকে দেব? —হ্যাঁ। একটু ডেকে দাওনা।

ও! গলার স্বরটা এত তীক্ষ্ণ। গিন্নি মনে হয় প্যারেড করতে করতে আসছে। না হলে দেরি হয়।

—কী জন্যে ফোন করলে। রান্নার মশলাপাতি জিজ্ঞাসা করার জন্য। —আ-হা, চলে এসো। না হয় একটু বাজে কথা বলে ফেলেছি। রাগ ধরে রাখলে চলে। —শোনো আমাকে যদি আবার পুষতে হয়, আগে তোমার পোষা কুকুরগুলোকে তাড়াবে। খোকাও একমত, আর কিছু মনে হয় তোমার ও শোনার বলার নেই? —তুমি এসে পড়লে, দু'জনে মিলে যদি দিলীপকে বোঝাতাম? —আজ সব কিছু মাধুরি ফোন করে জানিয়েছে। এর পরেও তুমি কী করে বলছো! কথাগুলো যদি মনে ধরে ফোন কোরো (ঘটাৎ)।

একি রে বাবা! কোন থানার ও.সি-র সাথে কথা বললাম নাকি! শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে দিল না। দিলীপ ও মাধুরি মিলে জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

দেখতে দেখতে আরো দুই রাত্রি পেরিয়ে গেছে। রাতগুলিতে অবিনেশ দুই চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারেনি।

রাত্রে পাশের বাগানের গাছ থেকে আম ও নারকেল পড়ার শব্দে ইট ভেবে অবিনেশ চমকে উঠেছে। বুক ধুপ-পুকানির সাথে চুপি চুপি আলো না জ্বালিয়ে বাইরে এসে, মনের ভুল বুঝতে পেরে জ্যাক ও রকিকে আদর করে আবার ঘরে ফিরে গেছে। সিলিং ফ্যানটা ফুল স্পিডে দিতে পারছে না—যাতে অজান্তে যদি কিছু অঘটন ঘটে।

ও'দুটোর জন্য যা হচ্ছে এই কয়েক দিনে অবিনেশের জীবনে, পাশের বাড়ি, বৌ-ছেলে, ক্লাব। বাধ্য হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। না হলে বিনি পয়সায় দিয়ে দেবে মনে মনে অবিনেশ ঠিক করে ফেলেছে।

এই কয়েকদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনের কক্ষে শতরাগ, ঘৃণা ও একরাশ বিরক্তি নিয়ে অবিনেশ যতবার জ্যাক্ ও রকির সামনে দাঁড়িয়েছে, তাদের করুণ চাউনিতে রাগের পরিবর্তে মায়াতে জড়িয়ে পড়েছে। খেলা করার জন্য ভুঁক ভুঁক ডাক। আদর খাওয়ার জন্য মাথা এগিয়ে দেওয়া।

স্বার্থবাজরা দুটি অবলা পশুর প্রতি এতটা দয়াহীন হতে পারে। অবিনেশের সর্বপ্রচেষ্টা ফিকে হয়ে পরাজয়ে পরিণত হতে চলেছে। হবেই না কেন? যেখানে এই বিপদে বৌ-ছেলেকে পাশে পাওয়া যায় না সেখানে নিষ্ঠুর সমাজের সাথে অবিনেশ একা লড়বে কি করে।

আজ সারাদিন জ্যাক্ ও রকি মুখে কিছু দেয়নি। সারাদিন শুয়ে থেকে অবিনেশের আসা যাওয়া লক্ষ্য করে গেছে। তারাও কি বুঝতে পেরেছে এই বাড়ির দ্বার চিরতরে বন্ধ ...

এবার অফিস থেকে ফোনের অপেক্ষায়। কী ব্যাপার অবিনেশ কামাই এর পর কামাই করে যাচ্ছ। জানাবার প্রয়োজন বোধ করনি। আগামীকাল এসে কারণ দর্শাবে। সামনের যে ইন্‌সেনটিভ পাবার কথা ছিল তা আপাতত ...।

বুকে চাপ বোধ, দম বন্ধ ভাব, হার্ট অ্যাটাক্-এর লক্ষণ মনে হয়।

বিসর্জিত দূর্গা

ঋক কুণ্ডু

অনেক রাত হয়ে গেল নার্সিংহোম থেকে বের হতে। সাথে লাবণী। বিয়ের দু'বছর হওয়া সত্ত্বেও সবরকম সুখ থেকে রোহিত বঞ্চিত। জীবনের চূড়ান্ত সত্যকে না মেনে উপায় নেই। সেও মেনে নিয়েছে। ডাক্তারবাবুর কথাগুলো কানে বাজছে তার। লাবণী আর ক'দিনই আছে। শারীরিক সুখ না পেলেও মন থেকে লাবণীকে ভালোবেসেছিল সে। আজ যেন আবার তার চোখে জল।

ডাক্তারি কাগজ-পত্র গুলো লাবণীর হাতে দিয়ে রোহিত তাকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিলো। ড্রাইভারকে বলল, "কলেজস্ট্রিট"। লাবণী ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল "তুমি যাবে না?"

"আমার কাজ আছে। তুমি বাড়ি যাও। আমি পরে যাচ্ছি।"

ট্যাক্সির জানালার বাইরে তাকিয়ে সে তার জীবনের ব্যর্থতার কথাগুলো ভাবছিল। হঠাৎ খেয়াল হল গাড়ি রং রুটে যাচ্ছে। বিস্মিত লাবণী ড্রাইভারকে কৌতুহলী ভাবে জিজ্ঞেস করে "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?"

ড্রাইভার নিশ্চুপ। গাড়ির স্পিড দ্বিগুণ। সে রোহিতকে ফোন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আউট অফ রিচ। ড্রাইভার গাড়ি থামাল। নির্জন জায়গা। তার শত আর্তনাদেও সাড়া দেওয়ার কেউ নেই। সমস্ত ইজ্জত লুটে নেওয়ার পর ড্রাইভার নদীতে ছুড়ে ফেলে দিল লাবণীর দেহকে। কাজ শেষে পরম তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল সিটের ওপর পড়ে থাকা মেডিক্যাল রিপর্টে। মুহূর্তেই তার উজ্জ্বল মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রিপর্টে লেখা লাবণী এইচ.আই.ভি পজিটিভ।

অসূরকে বধ করে বিসর্জিত দুর্গা প্রতিমার মতো ভেসে যাচ্ছে লাবণীর দেহ। জীবনের অন্তিম যুদ্ধে লাবণী আজ বিজয়িনী।

দিলরুবা

সব্যসাচী বসু

বিশ্বনাথ তাহার শয়নকক্ষটি পরিষ্কার করিয়া খিড়কি দরজা খুলিয়া সোজা ঘাটে আসিয়া বসিল, হাতে তাহার দিলরুবাটি।

বিশ্বনাথ গঙ্গারামপুরের জমিদার ওংকারনাথ সেন মহাশয়ের তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠতম। বড়ো ছেলে রাজনাথ ও মেজো সোমনাথ দুজনেই ব্যারিস্টার, অধুনা যথাক্রমে বিলাত ও কলকাতায় কর্মরত; জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রিলোচনা বিবাহিতা, তার স্বামী শ্রীনিবাস ডাক্তার, এবং নিজেকে ছাড়া সকলকে দেখিলে এমত মুখবিকৃতি করে যেন কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে; কনিষ্ঠা সুলোচনা বিধবা, বয়স সবে উনিশ, ইতোমধ্যেই পতিবিয়োগের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, পরিবারে মা ছাড়া একমাত্র এই বোনটির সহিতই বিশ্বনাথ গত দুই বৎসরে বাক্যালাপ করিয়াছে, আসলে সুলোচনাও তাহারই মতোই দুঃখী কিনা।

পিত্রালয়ে কেহ ভাড়া দিয়া বাস করে, এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরলতম, বিশ্বনাথই বোধ করি প্রথম ব্যক্তি যে নিজ পিত্রালয়ে ভাড়া দিয়া বাস করে।

আসলে বিশ্বনাথের বয়স একুশ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পিতা ওংকারনাথের বক্তব্য সে মানুষ হয় নাই, যদিও সে দুই পদে ভর করিয়া হেঁটে থাকে এবং দেখিতেও মনুষ্যরূপী। পিতার এরূপ চিন্তার কারণও আছে, একটি একুশ বছরের জোয়ান ছেলে যদি চাকুরী কিংবা রোজগারের প্রচেষ্টা না করিয়া কেবল বাদ্যযন্ত্র লইয়া পড়িয়া থাকে, তবে যেকোনো পিতাই এরূপ ভাবিতে বাধ্য।

গতে বাঁধা পড়াশুনা বিশ্বনাথের পছন্দ হয় নাই কখনোই, তাই কোনো মতে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করিয়া সে পড়িয়াছিলো চিলেকোঠার ঘরে পড়ে থাকা তাহার পরলোকগত পিতামহ ইন্দ্রনাথের দিলরুবাটি লইয়া তাহার উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলো। ইহার পর সুদুর কলকাতায় গিয়া সে খুঁজিয়াছিলো কে দিলরুবা বাজাইতে পারে এবং তাহাকে শিখাইতে পারে, শেষমেশ গড়ের মাঠে এক বিকেলে এক ফকির গোছের লোককে পায় যে তাহাকে তাহার মতো করিয়া দিলরুবা শিখাইতে সক্ষম, তাহার পর গত আড়াই বৎসরে তাহার দিলরুবা শিক্ষা চলিতেছে।

পিতার সহিত বাদানুবাদের জেরে সে পিতাকে কহিয়াছিলো তাহার ভরণপোষণের ভার সে নিজেই নিতে সক্ষম এবং যতোদিন না সে বিলাত যাইতেছে, ততোদিন সে গৃহে ভাড়া দিয়া থাকিবে খাইবে।

তাহার পর কাজের খোঁজ শুরু এবং এক সাহেবের আপিসে হিসাব রাখার কাজ পাইয়া তাহাই করিতেছে দিনের বেলা আর রাতে বসিতেছে তাহার গবেষণা লইয়া।

পাঠকেরা বোধ করি অবাক হইতেছেন, এহেন ভবঘুরের আবার গবেষণা! সত্যই বিশ্বনাথ এক গবেষণায় রত, তাহার গবেষণা, সে তাহার দিলরুবাতে মোৎসার্টের সুর বাজাইবে।

তাহার আপিসের সাহেবের গৃহে গ্রমোফোনে প্রথমবার সে মোৎসার্ট শুনিয়াছিলো, তাহার পর থেকে নেশাগ্রস্তের মতো হইয়া পড়ে। সাহেবের থেকে একটি রেকর্ড সে লইয়া আসে এবং প্রতি সন্ধ্যায় সিগ্রেট ধরাইয়া তাহা শোনে, এবং চেষ্টা করে দিলরুবাতে তাহা বাজাইতে।

সিগ্রেট টানিতে টানিতে এইসকল কথাই সে ভাবিতেছিলো, সম্মুখে বহিয়া চলিতেছে অতল ভাগিরথী। কি মনে করিয়া দিলরুবাটি হাতে তুলিয়াও রাখিয়া দিলো। ভাবিতে লাগিলো, ভগিনী সুলোচনার ভাতারখাকি অপবাদ তাহাকে ঘুচাইতে হইবে, তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে হইবেই। একবার, শুধু একবার তাহার এই দিলরুবা তাহাকে সাফল্য দিক, সে বোনকে লইয়া বিলাত যাইবে, তাহার অমন টুকটুকে বোনের বিবাহ হবে বিলাত ফেরৎ উকিলের সাথে, সে নিজে দাঁড়াইয়া তাহা করিবে। একবার, শুধু একবার ....

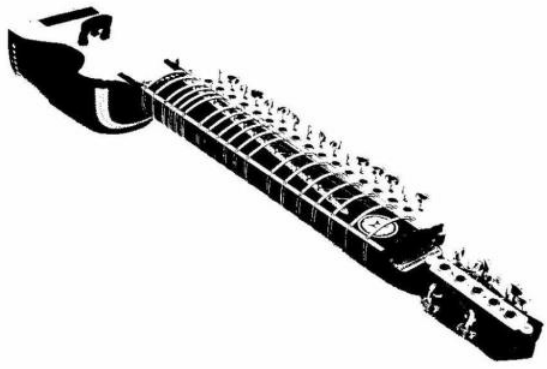

স্বীকারোক্তি

অভিজিৎ চৌধুরী

বড় রাস্তার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী একটি ছেলে, সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে একনাগাড়ে সঞ্চয়িতা পড়ে যাচ্ছে।

ছেলেটির কোনো প্রেমিকা নেই, কল্পনা আছে। ওর সস্তা হাফ ফতুয়া আর কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা প্রতিবাদের ভাষা বোঝে। কাছের কারোর স্পর্শ চেনে। ওর উপলব্ধির সীমানা আকাশের মতোই বিস্তীর্ণ।

আপোষ করতে করতে যদিও ওর চোখেমুখে অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। তবু আভিজাত্যের জামাকাপড়ে ঢাকা ছালচামরা ওঠা একটা চেহারা ও বেয়াদপ যৌনাঙ্গের মতো, অন্তর আর শরীরের পার্থক্যটা এতো সহজে ভুলে যায়নি ও। পাতার ভাঁজে ভাঁজে বেড়ে ওঠা সাহসী অক্ষরগুলিকে ঘিরেই ও নিজের একটা পৃথিবী গড়ে তুলেছে।

মানুষ এখন পিছুটান দূরে ঠেলে যে যার মতো স্বাবলম্বী হচ্ছে। অপলকা ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে একটা একটা করে স্বপ্নকে ধাক্কা মেরে খুন করে ফেলছে। কিন্তু 'আধুনিকতা' এখানেই থামতে রাজি নয়। রাত নামার সাথে সাথেই মাঝেমধ্যেই পাশবিক ক্ষিদের নেশা তাড়াহুড়ো করে হিংস্রতার চেইন খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বছর সাতের নিষ্পাপ শিশু কিংবা অফিসফেরৎ কোনো সংগ্রামের উপর। বাকিরা ড্রয়িংরুমে বসে চ্যানেলের পর চ্যানেল ঘুরিয়ে মোমবাতি জ্বলতে দেখছে, কেউ কেউ আবার খবরের কাগজে স্রেফ মুখরোচক খবর খুঁজছে। বিশ্বাস করা যায় ...

গোটা একটা জীবন নির্দ্বিধায় লন্ডভন্ড করে দেওয়ার পরেও যন্ত্রণায় কাতর ওদের সারা গা ব্লেড দিয়ে চিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। শখ মিটে যাওয়ার পর মাতৃত্বের বুক ফাটা চিৎকারকে ওরা এক নিমিষে গাড়ি চাপা দিয়ে থেঁতলে দিচ্ছে।

কি ভয়ঙ্কর 'আধুনিকতা'!

অন্যদিকে এখনো, বড় রাস্তার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী একটি ছেলে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে একনাগাড়ে সঞ্চয়িতা পড়ে যাচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে লোক জড়ো হয়ে গেছে ওর চতুর্দিকে।

সবাই রীতিমতো হতবাক!

আসলে ছেলেটি জানে—

পুড়ে যাওয়া মাটিতে বিপ্লবের বীজ পুঁততে গেলে,
প্রথমে ভালোবাসার জন্মান্তর ঘটাতে হবে।

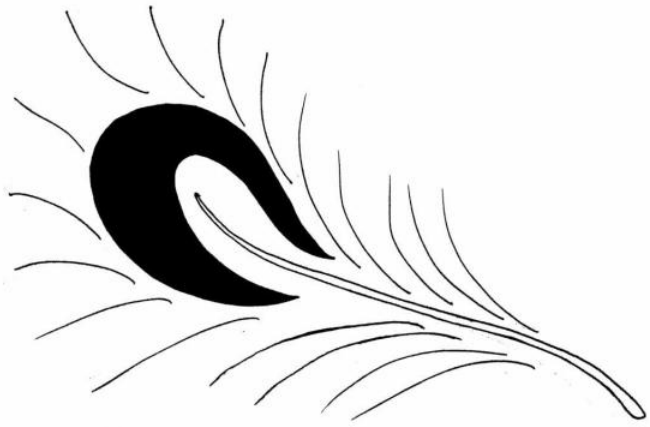

ঠাণ্ডা কি শীত

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

হুঁ, চা খেতে আসে দুজনে। পাড়ার দোকান। একই টেবিলের এপাশে ওপাশে মুখোমুখি হয়ে সকালবেলা নোনতা বিস্কুট দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চা খাওয়া। পাড়ার মানুষ। অথচ কথা নেই। পরিচিত। অথচ বন্ধুত্ব নেই। এমন হয়? হবে না কেন। এ ওকে চেনে, সে তাকে চেনে। কিন্তু আলাপসালাপের শিকলে সহজে কেউ পা জড়াতে চায় না। না ইনি। না উনি। কাজে সতর্ক পা ফেলে এড়িয়ে এড়িয়ে চলা।

কিন্তু সেদিন সকালে কি করে যেন দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মানে কথার সঙ্গে কথার ঠোক্কর। তাপ? ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ সঞ্চার? যেন তা-ও কিছুটা হল।

উঃ, কাল বড্ড গরম গেছে।

বলেন কি মশাই, আমার যে কাল শীত করছিল।

অ্যাঁ! শীত করছিল। কাল কখন বলুন তো?

এই, রাত ন'টা।

আমিও তো তাই বলছি—তখন মোটেই শীত করার কথা না। দেহ অসুস্থ না থাকলে, মানে জ্বরটর গায়ে না থাকলে গরমে হাঁসফাঁস করার কথা।

আপনি হাঁসফাঁস করছিলেন বুঝি?

হুঁ, আপনি? শীতে কাঁপছিলেন?

ঠকঠক করে কাঁপছিলাম মশাই, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সেই ঠাণ্ডা প্রায় হৃৎপিণ্ড ছুঁতে চলেছিল।

আশ্চর্য, আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না, এত গরম, আর আপনি ঠাণ্ডায় মরছিলেন।

আমিও তো তাই ভাবছি, এত ঠাণ্ডা, আর গরমে আপনি—? প্রেসার আছে বুঝি?

আছে বৈ কি। কাল তেষট্টি পেরিয়ে চৌষট্টিতে পা দেব, ওই জিনিস থাকবে না? হাসালেন।

লো?

হাই।

কাজেই এমন হতে পারে না। ককখনো না। একই সময়, একই পাড়া, একই বয়স, একই জাতের প্রেসার—অথচ আপনার এল কাঁপুনি দিয়ে শীত, আর আমার কিনা গরমে প্রাণ যায়।

আচ্ছা, রাত কটা তখন ঠিক করে বলুন তো?

বললুম তো, ন'টা, বড় জোর ন'টা পাঁচ কি সাত হবে। ও, হ্যাঁ, তখন আমাদের এই রাস্তা দিয়ে মেলা ঝাণ্ডাটাণ্ডা নিয়ে এতবড় একটা মিছিল যাচ্ছিল। দেখেছিলেন?

দেখেছিলাম, হুঁ, খুব দেখেছিলাম। তখন আমি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দেখছিলাম এবং নানারকম আওয়াজে কানে তালাও লাগছিল।

ঠিক সেই সময়, ঝাণ্ডা উঁচিয়ে আওয়াজ দিতে দিতে যখন ওরা রাস্তাটা পার হয়। গরমে আমি মরছিলাম।

হুঁ, ঠিক তখনই, আওয়াজ দিতে দিতে ওরা রাস্তাটা পার হল কি দড়াম্ করে পটাকা ফাটল। রাস্তার ধারে গাছতলায় বুড়ো ভিকিরিটা খড়কুটো জ্বেলে চালেডালে সেদ্ধ করছিল—সেখানেই উপুড় হয়ে পড়ে গেল। ধোঁয়া, তারপর রক্ত। দেখে আমার এমন শীত করছিল। হৃৎপিণ্ড প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে যাবার দশা!

তাই বলুন, মিছিলটা যখন রাস্তা পার হচ্ছিল তখন না, যখন পার হয়ে গেল, যখন দড়াম করে ওটা ফাটল, তখন আপনার ইয়ে করছিল।

ঐ একই কথা।

না দাদা, সময়ের এক সেকেন্ড এদিক ওদিক শরীরের অবস্থার বিশেষ করে এই বয়সে, বিশেষ করে প্রেসার থাকলে, মারাত্মক রকমফের ঘটে। আসুন—

এই বুড়ো সেই বুড়োকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল।

অধিকার

বিজয়দান দেথা

অনুবাদ ঃ কমলেশ সেন

নতুন বৌ। সবে বিয়ে হয়ে এসেছে। সে এক ফকিরকে ভিক্ষে না দিয়ে ফিরিয়ে দিল। ফকির খুব রুষ্ট হল। রাগ-অপমানে তার চোখ-মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে গালিগালাজ দিতে দিতে সে ফিরে যাচ্ছিল। পথে বৌটির শ্বাশুড়ির সঙ্গে দেখা। ফকিরটি শ্বাশুড়িকে অভিযোগ করল, 'তোমার বৌয়ের এতো হিম্মত, একজন ফকিরকে ভিক্ষে দিল না। একজন ফকিরকে একমুঠো আটা, এক-আধটা রুটি দিলে কি সংসারে অনটন দেখা দিত। হায়, কেমন সময় পড়েছে। প্রতিটি বাড়ির বৌ এখন বাড়ির কর্ত্রী হয়ে গিয়েছে।'

শুনে শ্বাশুড়ি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে এসব অনাসৃষ্টি হতে দেব না। এতো সাহস! চলো আমার সঙ্গে!'

ফকির খুব খুশি হল। শ্বাশুড়ির মাথা থেকে ভারি কাঠের বোঝাটা নিজের মাথায় তুলে নিল। সারাটা পথ শ্বাশুড়ি বৌকে গালিগালাজ দিতে দিতে চলল। খুব, খুব ঠুসতে লাগল বৌটিকে। এর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করল। বাড়িতে পৌঁছেই ফকিরের মাথা থেকে শ্বাশুড়ি কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বৌকে গালিগালাজ করতে লাগল। ওকে বেশ কথা শোনাল। মন উজার করে যা ইচ্ছে তা-ই বলল। ওর এতো সাহস, একজন ফকিরকে ভিক্ষে দেয়নি।

ফকির ভাবল, আজ তার পোয়া বারো। বেশ কয়দিন আর ভিক্ষের জন্যে বেরুতে হবে না। অবশেষ শ্বাশুড়ি বাইরে এল। বাইরে এসে বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে এ মানা করার কে! মানা যদি করতেই হয়, আমি করব। যাও, এখান থেকে চলে যাও। ভিক্ষাটিক্ষা হবে না। ও কে মানা করার! নবাবজাদি কোথাকার!'

ঈশপের গল্প

বিষ্ণু নাগর

অনুবাদ ঃ কমলেশ সেন

একদিন এক সংবাদপত্রে ঈশ্বরের ইন্টারভিউ ছাপা হয়। সেই ইন্টারভিউ নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। ইন্টারভিউটা ছিল এরকম ঃ

ঈশ্বর, আপনি কোন ধর্মাবলম্বী?

আমি তো জানি না, পৃথিবীতে কোন কোন ধর্ম আছে?

ঈশ্বর, আপনার লীলাভূমি কোথায়?

এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে, তাই মন্তব্য করব না।

ঈশ্বর, আপনি সাকার, না নিরাকার রূপ বেশি পছন্দ করেন?

এ-ব্যাপারে আমি কোনোদিন ভাবিনি।

ঈশ্বর, সংস্কৃতকে দেব ভাষা বলা হয়। আপনি কি এ-ভাষায় কথা বলেন?

কোনো জবাব দিলেন না। শুধু মিষ্টি হাসলেন।

ঈশ্বর, আপনার প্রিয় ধর্মগ্রন্থ কি?

ধর্মগ্রন্থের চাইতে অন্য গ্রন্থ আমি পড়তে বেশি ভালোবাসি।

আপনি নিরামিষ, না আমিষ খান?

যখন যেটা ইচ্ছা করে।

ঈশ্বরের এই বক্তব্যে চারদিকে হৈচৈ—বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঘা পড়ে। তিনি সংবাদদাতার ওপর অনৈতিক আরোপ লাগালেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সংবাদপত্র একান্ত ঘরোয়া আলাপচারিতা না ছাপিয়ে, তার নিজস্ব বক্তব্য ছাপিয়েছে। সে যে বক্তব্য বলেছে, তা ছাপাল এই হুজ্জত—এই হাঙ্গামা হত না।

আঁকি বুকি

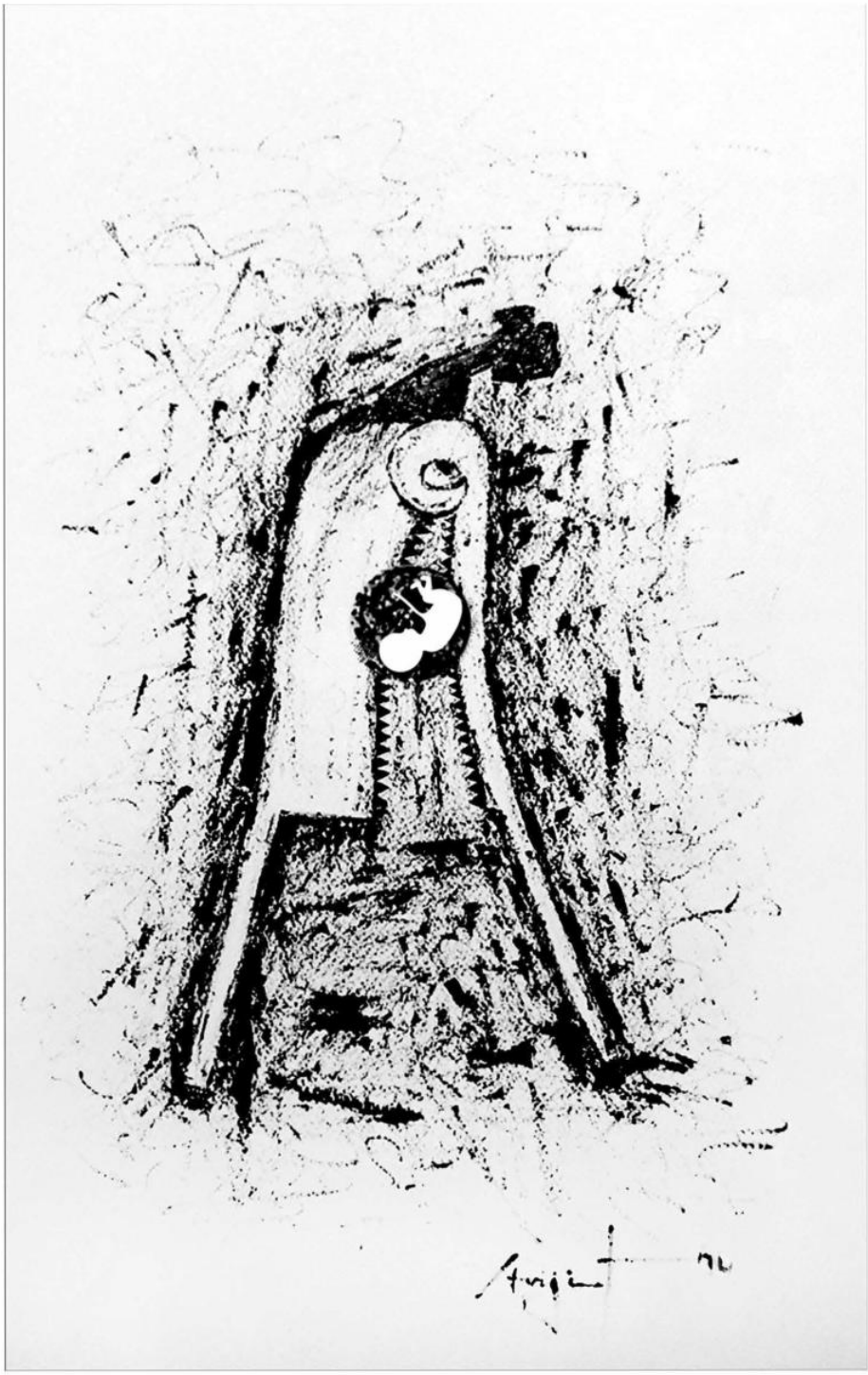

শিল্পী - অভিজিৎ শীল

Title : The Savage -III

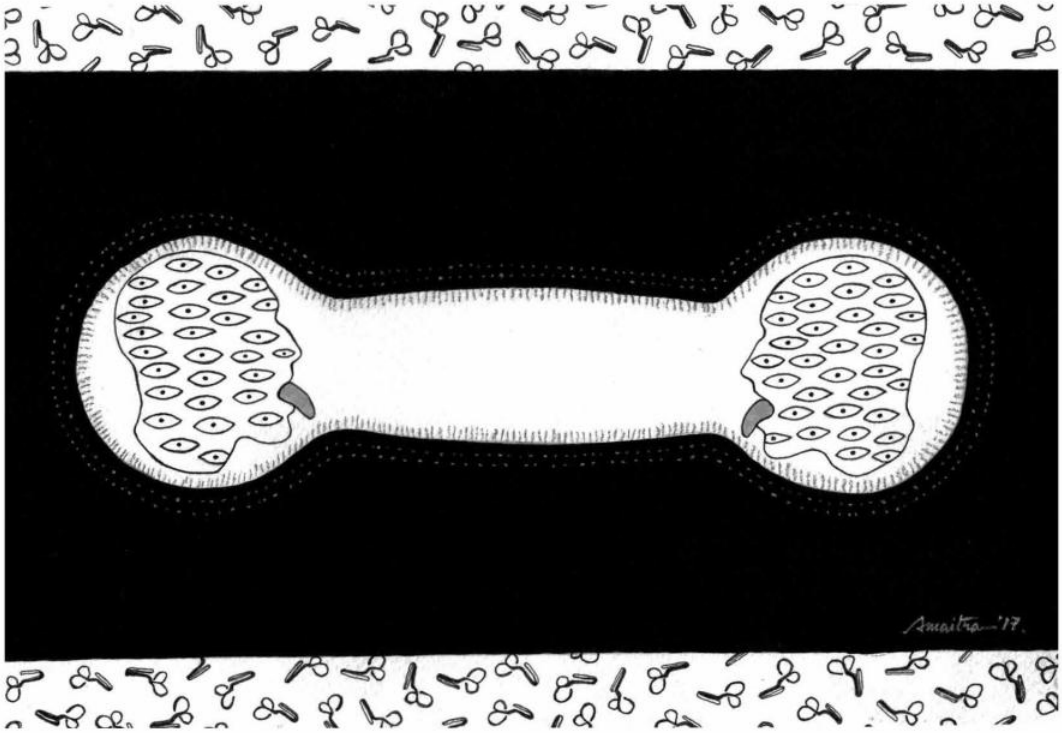

- অভিরূপ মৈত্র

Title : অ

- সঙ্গীতা সেন

Title : Pure Relatio

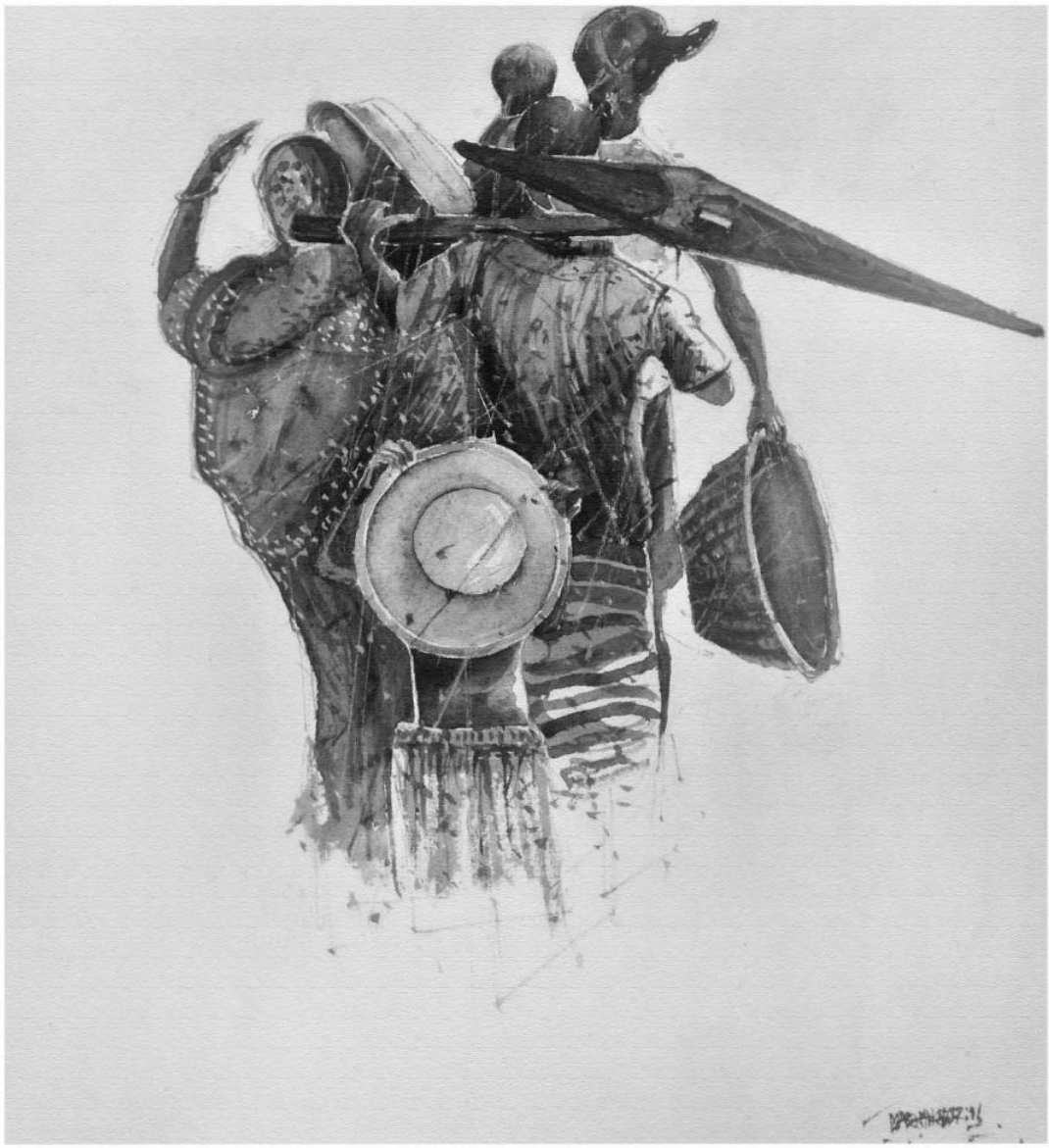

- মারজান কবির

Title : Walk for

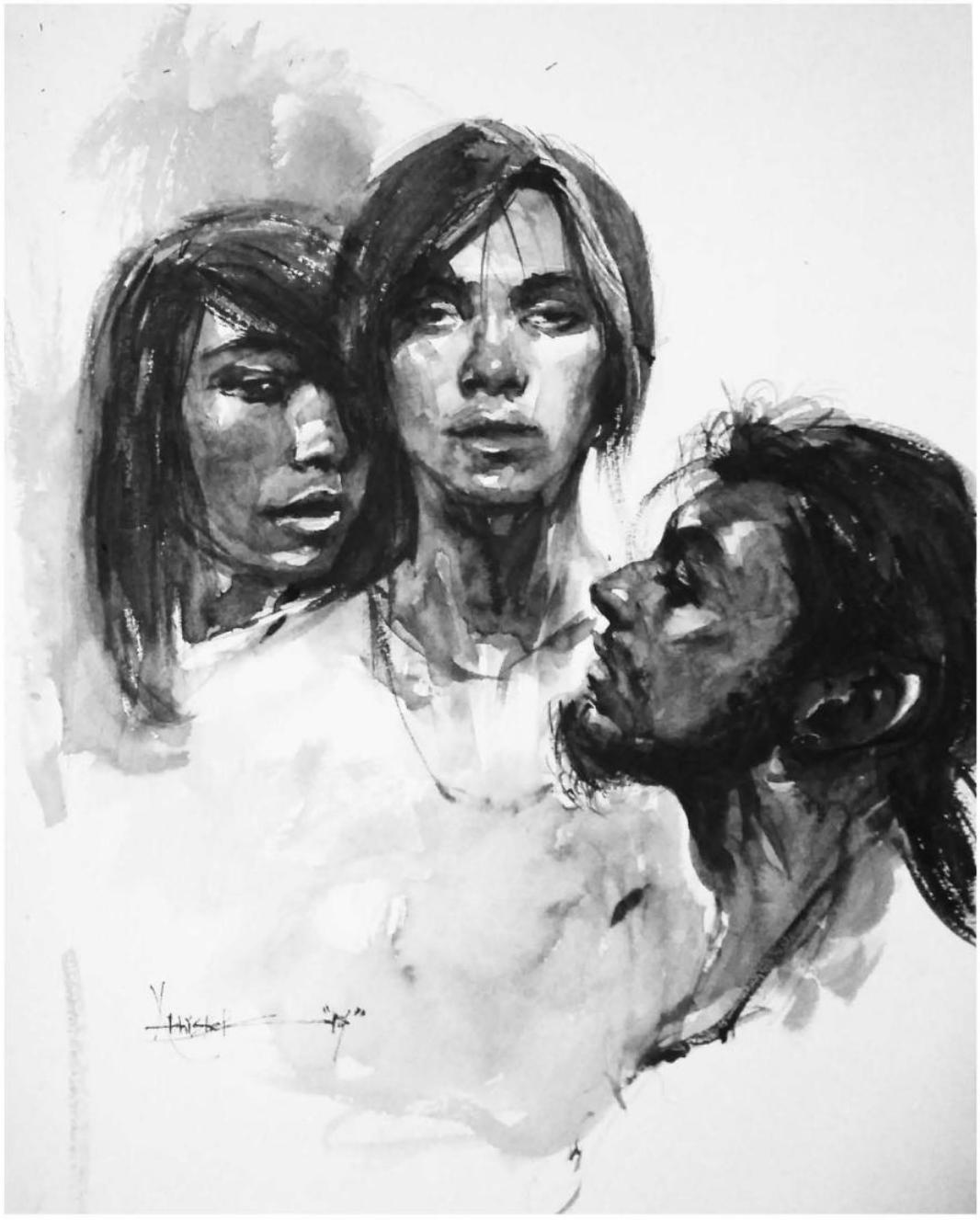

অভিষেক ইন্দু

Title : Fragrance Bisexu

হৃদয়বাসরীয় সংলাপ

শুভংকর গুহ

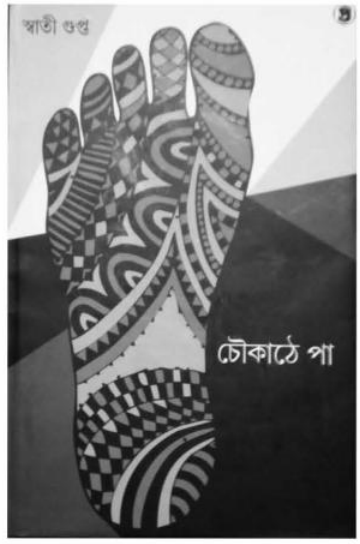

বেশ কয়েকদিন আগেকার একটি কথা বলি—বাংলা সাহিত্যের একজন মুগ্ধ পাঠক আমাকে বলেছিলেন সাম্প্রতিককালের তিনি খুব কম লেখকের লেখা পড়েন। কারণ অধিকাংশ লেখকের লেখায় তিনি ভাষার ল্যান্ডস্কেপ খুঁজে পান না। আমি কথাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হতে পারলেও আলতো বিনম্র সমর্থন পোষণ করেছিলাম। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন, —কোনো কোনো সময়ে শব্দচিত্র আমাদের চেতনা ও বোধের গহীনে শব্দের নিসর্গ নির্মাণ করে। সেই শব্দের মাধ্যমে যদি বিষণ্ণতা, নির্জনতা, একাকীত্ব, প্রাকৃতিক উপলব্ধি, প্রেম, ঘৃণা, প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির নিঃশব্দ পায়চারি উপলব্ধি করা যায় তবেই সেই সংলাপ আমাদের আক্রান্ত করে। ক্রমাগত গড়ে ওঠা কিছু সংলাপ ব্যক্তি অনুভবের মাধ্যমে উঠে এসে পরাবাস্তব চেতনার দিকে ধাবিত করে, নির্মাণ করে অনভ্যস্ত বৌদ্ধিক আচরণ। সব কবিতাই কবিতা হয়ে ওঠে না। তবে অনেক সময় অনেক সংলাপ কবিতার মতন হয়ে ওঠে। এটাই পাঠক হিসেবে আমি মনে করি খুব বড় প্রাপ্তি।

সাম্প্রতিক তরুণী কবি স্বাতী গুপ্ত-র চৌকাঠে পা কবিতা গ্রন্থটি আমার সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছে। স্বাতীর কবিতাগুলি পড়তে পড়তে বিভিন্ন বহুমাত্রিক ভাবনা আমাকে ক্রমাগত মুগ্ধ করেছে। ছোটো ছোটো কথার মধ্য দিয়ে স্বাতী ব্যক্তি অনুভবের নানান দরজা খুলে দিয়েছেন। শরীরের যেমন নিজস্ব গন্ধ থাকে, থাকে নিজস্ব একটি আদল, উপস্থিতির নির্দিষ্ট একটি সময়কাল। সেই শরীরের বিনাশ হয়ে গেলে আমরা কখনই বলি না অমুক সময়ে সেই বিশেষ শরীরটি উপস্থিত ছিল। বলি তিনি বা তাঁর অস্তিত্ব তখন বর্তমান ছিল। মানুষের শরীর কখনই ইতিহাস হয় না। তাঁর অস্তিত্বই ইতিহাস হয়, হয় তাঁর অবর্তমানে প্রেম, ঘৃণা, স্নেহ, অনুরাগ এবং মহত্ব। স্বাতীর কবিতায় মানব মনের ছোটো ছোটো অভিমান, অনুরাগ, মহাজাগতিক শূন্যতা, প্রকৃতির অসামান্য আলো ছায়ার ম্যাজিক, আরণ্যক রহস্য, কখনো মানবিক সম্পর্কের বেইমানি, এক জমাট নিঃসঙ্গ বেদনা তাঁর কবিতার মূল উপাদান। কখনো কখনো স্বাতী তাঁর ব্যক্তি ভাবনায় সেই মানব অস্তিত্বের কথা অনায়াস বলেন একান্ত ব্যক্তি অনুভবের মাধ্যমে, বিরল এক স্মৃতির স্মরণি ধরে। কি চমৎকার ব্যবহারিক জীবনের উপাদানকে আশ্রয় করে অনায়াসে লিখে যান—শৌখিনতার শেষচিহ্ন সুগন্ধি শিশি / ফুলদানির শেষ ক্যামেলিয়া / সংসার এ সবকিছু বড়ো বেশি / সঠিক জায়গায় রাখা ... (কবিতা; শেষ চিঠি আকাশের গায়ে)। অসামান্য সরলতায় ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি বলে যান—"আমি আমার অনুভবের, চেতনার কথা লেখার শুধুমাত্র চেষ্টা করি। শুধুই আমার ব্যক্তি অনুভবের কথা যা আমাকে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত করে। আমার প্রকৃতি চেতনা যা আমার জন্মগত অর্জন। এই সব কথা লিখে যাওয়ার চেষ্টা করি। কখনই মনে করি না তা চূড়ান্ত। আসলে চূড়ান্ত বলে কিছু হয় না।"

দিগন্ত রেখায় পাহাড়ের সারি যেন এক পরাবাস্তব ছবি। একদিকে ডুয়ার্সের জঙ্গল অসংখ্য নদীর উচ্ছ্বাস গ্রীষ্মকালে শুধুই সাদা বালির দাগ, সীমাহীন জমি জুড়ে চায়ের বাগান, বনাঞ্চলের কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ, আশ্বিনের ধান, মহাকালের মানে হাতির বিচরণ, উঠোনে চিতা বাঘের থাবা, ঘরের সিলিং জুড়ে স্থির তক্ষক, জমাট নিঃসঙ্গতা নির্জনতা এসব কিছুর মাঝেই স্বাতীর কবি মনের বেড়ে ওঠা। নরম পালকের মতন মন ও মননকে স্বাতী অতি যত্নে লালন করেছেন। নিজের মূল্যবোধের সাথে অনুভবের রসায়ন ঘটিয়ে লালন করেছেন নিজের ভাবনাকে। তাঁর গ্রন্থটি পড়তে পড়তে কখনই মনে হয়নি শুধুমাত্র বিলাসিতার জন্য তিনি লেখেন। তাঁর লেখা পড়লেই মনে হয় নিজের অনুভবের সাথে সময় ও কালকে নিজের মতন করে চিহ্নিত করতে চান। যিনি মানবিক সম্পর্ককে প্রকৃতি চেতনার মধ্য দিয়ে একাত্ম করে স্পর্শ

করতে চান নিজের সামান্য অসামান্য চাওয়া পাওয়াকে, গড়ে তোলেন মায়াময় সংলাপ, নির্মাণ করেন হঠাৎ চমকে দেওয়ার মতন পঙক্তি। চা বাগানের ছায়া গাছের মধ্যে খুঁজে পান নির্ভরতা। বৃক্ষের কাছে তাঁর কখনো কখনো আত্মসমর্পণ মুগ্ধ করে। আবার নিজের মনকে চমৎকার ভাবে সংজ্ঞায়িত করেন হাঁসের সঙ্গে বা তুলোর সঙ্গে, —শব্দের মিশ্রণে গড়ে তোলেন চমৎকার শব্দ, যেমন তুলোমন, হাঁসমন। খুব যে পালিশ করে, গভীর দার্শনিক ভাবনার মধ্য দিয়ে স্বাতী অতি রক্ষণশীল হয়ে শব্দচয়ন করে তাও নয়। কিন্তু তাঁর লেখায় মুগ্ধতার উপকরণ বিস্তর ছড়িয়ে থাকে। গভীর বিশ্বাস মগ্নতা ও অনুভবের মাধ্যমে স্বাতী নির্মাণ করেন কবিতার শরীর। ছোটো ছোটো কথা, টুকরো টুকরো স্মৃতি যাপন, প্রেম, প্রত্যাখ্যান, নিঃসঙ্গতার মায়াবী যাপন তাঁকে যন্ত্রণা দেয়। যতই তিনি যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছেন ততই তাঁর বিশ্বাস পোক্ত হয়েছে। স্বজন হারানোর বেদনা বা সময়কালের দাগ ও বিশ্বাস অবিশ্বাসের আলো ছায়ায় গড়ে তোলেন ছোটো ছোটো সংলাপের চমৎকার কোলাজ। এটিই স্বাতীর লেখার মাধুর্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থটি পড়লে বিখ্যাত ইংরেজ কবি Robert Frost-এর সেই অতিশয় বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়—Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words ...

স্বাতীর কবিতা গ্রন্থ চৌকাঠে পা-র প্রথম কবিতাটিই পাঠ প্রতিক্রিয়ায় মনোযোগী করে তোলে। কি অনায়াসে তিনি ক্যালেন্ডারে যখন বর্ষ বিদায় কবিতাটিতে লিখে ফেলেন ... আচমকা জঙ্গল স্তব্ধতা ছিন্ন করে গতি ... ট্রেনের হুইসেলে বন্যপ্রাণ ... সতর্ক নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে ... কাল ভোরে ডিমা নদীর তীরে ... বহু শতাব্দীর প্রাচীন সূর্য নতুন ... আশা নিয়ে উঁকি দেবে ...

আরও মনোযোগী করে তোলে অবশেষে যখন তিনি বলেন—আবারও পাথর কেটে জীবন নদী ... বয়ে চলবে এঁকেবেঁকে ... কবিতার শরীর জুড়ে ফুটে উঠবে অব্যক্ত কথা। পাহাড়ি নদীর বুকে আমরা যেমন খুঁজে পাই কিছু বিরল টুকরো পাথরের চমৎকার বিন্যাস তেমনি স্বাতীর কবিতায় খুঁজে পাই অনাদরে পড়ে থাকা স্পর্শহীন সংলাপ। পাঠক হিসেবে আমাদের বিস্মিত করে—

ড্রেসিংটেবিলে লিপস্টিকে / অপেক্ষা শীত কামড়ে / প্রতারণার রুক্ষতা / জমানো টিপে স্তর ধুলো (কবিতা-সভ্যতার বিবর্তন)

দৃঢ় এক সংকল্পের সাথে / ধীর নিশ্চিত অবগাহন আত্মহননে (কবিতা-হেমলক বিষাদ)

মায়াবাস্তবতায় আশমানি সিঁড়ি বেয়ে/জন্মান্তরের হজমিওয়ালা এসে দাঁড়ায়/শব্দের মিছিলে পায়ে পায়ে একদিন / নীরবতার চৌকাঠে পা বাড়ায় (কবিতা-অনুভূতি আজও আছে ৪)

তীব্র দহনকাল / বোবা যন্ত্রণাগুলো পাঁজরে / বাস্তবের কঠিন সত্য / চিরচেনা অপরিচিত দৃষ্টিতে (কবিতা-ছায়াগাছ ১)

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর স্পষ্টতায় / কালো আর আলোর সীমান্তে / তুমি আর আমি নামহীন একান্তে / আমার কায়াহীন ছায়া (কবিতা - কায়াহীন)

চাঁদ ছোঁয়া রাতে অরণ্য পথের নিস্তব্ধ রূপকথা / দ্রুতগতিতে পড়ে ফেলা আকাশের তারা (কবিতা-সংলাপ অব্যক্ত)

প্রতীক্ষা প্রহর আমার চৌকাঠে / নিঃশব্দেও চমকে ওঠা মন / ঋতু যায় আসে আকাশের গায়ে / দুরন্ত পায়ে একবার বেহিসাবি হয়ে / সবুজ গালিচায় যদি সে আসে ... (কবিতা-চৌকাঠে বাউল মন)

সাম্প্রতিক কবিতা যখন ক্রমশ দুর্বোধ্যতাগামী সেই সময়ে স্বাতী গুপ্ত-র আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে এক আরাম প্রশ্বাস। গ্রন্থটিতে মোট চল্লিশটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে বেশ কিছু সিরিজ পর্যায়ের লেখা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। যেমন নিসর্গ ১-৫, কথা ১-৪, ছায়াগাছ ১-৪, তোর জন্য ১-৩, অনুভূতি আজও আছে ১-৪ প্রভৃতি। আরণ্যক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সঞ্চয় করেছেন নানান অভিজ্ঞতা। প্রাকৃতিক নানান অনুষঙ্গে ভরে উঠেছে তাঁর প্রথম কবিতার বই। বর্তমানে চাকরিসূত্রে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। মানব জীবনের চিন্তা ভাবনার ও জীবন যাপনের অপুষ্টি তাঁকে ক্রমাগত বিচলিত করে। তাঁর লেখাতেও সেই কথা প্রকট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুদীপ্ত দত্ত।

চৌকাঠে পা—স্বাতী গুপ্ত
প্রতিভাস
১৮এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২
দাম-১০০ টাকা

গ্রন্থ সংবাদ

বিজয় দাস

একলা মানুষ

মূলত দক্ষিণ কলকাতাবাসী হলেও আদি বাড়ি রাজশাহী জেলায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতক ও বিজ্ঞাপন- জনসংযোগ বিষয়েও শিক্ষিত। লেখা এবং বই পড়ার পাশাপাশি জ্যোতিষ বিদ্যা চর্চাও করে থাকেন লেখিকা সুমিতা সান্যাল। 'একলা মানুষ' লেখিকার প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প গ্রন্থ, প্রকাশক ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। বইটিতে রয়েছে আঠারোটি অনবদ্য গল্প। শুরুর গল্প 'অন্তর্লীনের দশা ও দুর্দশা' যেখানে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী সাদামাটা অন্তর্লীন টাকা ধরার চেষ্টায় চাকরি ছেড়ে শেয়ার বাজারে নামলো। বিয়ে করে উঠতে পারেনি কারণ বউ নামক বস্তুটাকে তার অনেকটা অফিসের বসের মতো মনে হয়। পরিবারে লোক বলতে সে একাই। এই একাকী জীবন উপভোগের ফাঁকেও মাঝে মধ্যে একাকীত্বের কষ্টও অনুভব করে। দ্বিতীয় গল্প 'একলা মানুষ'। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ভারতীয় স্থপতি আনন্দ, হংকং বাসী চল্লিশ বয়সী ভারতীয় মুরলী, অথবা রাজীব কিংবা শরণ্য প্রতি চরিত্রকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের একাকীত্ব জীবনের সুন্দর প্লটে সাজিয়েছেন লেখিকা এই গল্পে। 'কড়া নাড়া' গল্পে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঝুট-ঝামেলা এড়ানো অন্যায়ে মৌন এক মধ্যবিত্ত বাঙালির খুন। বৃষ্টি ভেজা শহরের রাস্তায় ডেড বডি হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রী, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রত্যেকের আলোচনা সমালোচনা পেরিয়ে কিছুদিনেই ঝাপসা হয়ে যায়। মনে রাখার মধ্যে হয়তো সেই মেয়েটিই রেখেছিল, যাকে সেইদিন ট্রেনে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে ভিড়ের মধ্যে একমাত্র প্রতিবাদ করেছিল লোকটা। মুখ মনে করার চেষ্টা করলেও আবছা। বছর পেরিয়ে আবার বৃষ্টির রাতে শুনতে পায় দরজায় করাঘাত, কিন্তু সে ধাক্কা দরজায় নয়, এ করাঘাত বুকের ভিতর। এমনি অসাধারণ কিছু রচনা সম্ভারে পরিপূর্ণ এই বই। 'সূর্য নিভে গেলে', 'বস্ত্রহরণ পালা', 'পাগলামী' গল্প গুলির সাবলীল ভিন্ন স্বাদ ও রস প্রদানে সার্থক। রোজগারে একমাত্র রাস্তা ব্লাউজ, স্কার্ট, শাড়ির ফলস সেলাই। কাজ, শোওয়া, খাওয়া সব এক ঘরেই। মল্লিকা ও সুন্দরীর ঘর। সাদা হলদেতে মেশানো সাধারণ চেহারার সুন্দরী। সুন্দরী এখন পূর্ণবয়স্কা বেড়ালী। মল্লিকার একাকী জীবনে সুন্দরীই একমাত্র সঙ্গী। গল্পের নাম 'বেড়াল'। 'এক বাক্স উত্তাপ'-এর এক রাজনৈতিক নেতা অথবা 'আকাশমুখী' গল্পের হৈমন্তী কিংবা 'তিরিশ বছর ধরে' গল্পে নন্দিতা, প্রতিটি চরিত্রের সৃষ্টি ও উপস্থাপনা খুব সাবলীল। শেষ গল্প 'হিসাবের খাতা' তৃষ্ণা ও অনাদির এক অস্থির দাম্পত্য জীবন। লেখিকা অসাধারণ দক্ষতায় ও সুন্দর ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন জীবনের বিভিন্ন দিক ও রঙ। নিঃসঙ্গতার মাঝে দ্বৈত স্বত্ত্বা এই বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ।

একলা মানুষ, সুমিতা সান্যাল
ভাষাবন্ধন প্রকাশনী
৩/৫২, বিজয়গড়
কলকাতা-৭০০০৩২
দাম - ১৫০ টাকা

কবিতীর্থ

'কবিতীর্থ', ছত্রিশ বর্ষ আশ্বিন ১৪২৪। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ বিশ্ব সাহিত্যের দুই অসামান্য স্রষ্টা, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রখ্যাত কবি ইয়েভগেনি আলেকজেন্দ্রোভিচ ইয়েভতুশেঙ্কো এবং অন্যজন বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ডেরেক ওয়ালকট, জন্ম ক্যারাবিয়ান সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে সেন্ট লুসিয়া নামক দ্বীপ রাষ্ট্রে। পত্রিকায় ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কোর কবিতা 'জিমা জংশন' রূপান্তর করেছেন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, অন্যান্য আরও কিছু কবিতার রূপ প্রদান করেছেন প্রদীপন দাশগুপ্ত ও শিহাব সরকার। এছাড়াও ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কোর সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণা, অসামান্য প্রবন্ধে বিপ্লব মাজী, মলয় রায়চৌধুরী, কামারুজ্জামান, সব্যসাচী ঘোষ। অমলকুমার মণ্ডলের ইয়েভতুশেঙ্কোর জীবনী ও অন্য বিবরণী তথ্যে সমৃদ্ধ। আর ডেরেক ওয়ালকটের পাঁচটি অগ্রন্থিত কবিতার সুন্দর রূপান্তর করেছেন অভীক চট্টোপাধ্যায়, অন্য আরও কিছু কবিতা, নোবেল অভিভাষণ ও সাক্ষাৎকারের ভাষানুবাদ করেছেন যথাক্রমে অংকুর সাহা, কামারুজ্জামান এবং অভীক চট্টোপাধ্যায়। অর্ক চট্টোপাধ্যায়, অমলকুমার মণ্ডল, চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অংকুর সাহার বিশ্লেষণী প্রবন্ধ মুগ্ধ করে। বিশেষ প্রকাশনায় আছে কহলিল জিবরান রচিত 'দি গার্ডেন অফ দি প্রফেট' অনুসৃত কামারুজ্জামানের 'পয়গম্বরের বাগান'। এই তিন মহান বিদেশী সাহিত্যিক ছাড়াও রয়েছে বিনয় মজুমদার, অরুণেশ ঘোষ ও সমীরণ ঘোষের অপ্রকাশিত কবিতা। নির্বাচিত ভালো কবিতায় আছেন দীপক রুদ্র, রমাপ্রসাদ দে, মলয় রায়চৌধুরী, বিপ্লব মাজী, প্রশান্ত হালদার, মহম্মদ রফিক এবং আরও অনেকে। এবারের সংখ্যায় আছে নয়টি গল্প। কার্ত্তিক লাহিড়ীর 'নিজের মূর্তি-র সামনে' শীর্ষক গল্প সুন্দর ভঙ্গিমা ও এক বিমূর্ত রস প্রদানে সার্থক। দেবাশিস চক্রবর্তী, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, সপ্তদীপা অধিকারী ও দেবাশিস দাসের গল্পের অন্তঃশীল ভাবনা বেশ আকর্ষণীয়। এছাড়াও অভীক চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সাঁফুই, সুখেন্দুনারায়ণ ঘোষের ছোট কিন্তু বিষয়ের বিভিন্নতার বর্ণময় গল্প। একই সঙ্গে শুভংকর গুহর 'দাগ ধরে যাওয়া' গল্পের বিষয়ের অনুচিন্তা এক অনন্য আবিষ্কারের মতো। অনুপম মুখোপাধ্যায়ের গল্পটির চিত্ররূপময়দিকটি বেশ আকর্ষণীয়। এক কথায় সাহিত্য ও তথ্যে সমৃদ্ধ এই পত্রিকা সংগ্রহযোগ্য।

কবিতীর্থ। ১০৫তম ৩৬ বর্ষ আশ্বিন ১৪২৪
সম্পাদক ঃ উৎপল ভট্টাচার্য
৬৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯
৫০/৩, কবিতীর্থ সরণী, কলকাতা-৭০০০২৩
দাম ২৫০ টাকা